সৌজন্য সংখ্যা

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

আগস্ট ২০১৭ ■ শ্রাবণ - ভাদ্র ১৪২৪

প্রধান সম্পাদক
মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন

সিনিয়র সম্পাদক
মোঃ এনামুল কবীর

সম্পাদক
নাসরীন জাহান লিপি

শিল্প নির্দেশক
সঞ্জীব কুমার সরকার

সহ-সম্পাদক
শাহানা আফরোজ
ফিরোজ চন্দ্র বর্মন

সহযোগী শিল্প নির্দেশক
সুবর্ণা শীল

অলংকরণ
নাহরীন সুলতানা

সম্পাদকীয় সহযোগী
তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা
মেজবাউল হক
সানিয়া ইফফাত আঁখি

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৩১১৪২, ৯৩৩১১৮৫
E-mail : editornobarun@dfp.gov.bd
ওয়েবসাইট: www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৫৭৪৯০

প্রচ্ছদে ব্যবহৃত ছবি
তানজীম হোসাইন শান্ত, সপ্তম শ্রেণি, ঝিনাইদহ সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়

মূল্য : ২০.০০ টাকা

মুদ্রণ : মিতু প্রিন্টিং প্রেস, ১০/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ আর বাঙালি জাতি হারিয়ে ফেলেছে সবচেয়ে বড়ো সম্পদকে। এই সম্পদ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। যাঁর আহবানে সাড়া দিয়ে এ দেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। লাখো বাঙালির অসামান্য ত্যাগের বিনিময়ে এ জাতি অর্জন করেছিল স্বাধীনতা।

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে শুরু হয়েছিল দেশ গড়ার নতুন যুদ্ধ। বাংলাদেশ হয়ে উঠছিল সোনার বাংলা। এই দেশের শত্রুরা তা হতে দেয়নি। আর তাই রাতের আঁধারে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল হায়েনার দল। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের কালরাতে ঘাতকের নির্মম আঘাতে শহিদ হয়েছিলেন তিনি এবং তাঁর পরিবারের বেশিরভাগ সদস্য।

সেই থেকে আগস্ট মন খারাপের মাস। তীব্র শোকের মাস।

বাবা-মা-ভাইদের হারিয়ে শোকের সাগরে ডুবে ছিলেন বঙ্গবন্ধুর বড়ো মেয়ে শেখ হাসিনা। দেশ গড়ার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নকে সফল করে তুলছেন তিনি। তাঁর নিরলস পরিশ্রম আর দেশবাসীর সমর্থনে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। দেশকে গড়ে তোলার এই যুদ্ধে আছি আমি, তুমি, আমরা সবাই। কেননা, বাংলাদেশ আমাদের সবার ভালোবাসার একটি মাত্র দেশ। পৃথিবীর আর কোনো দেশ কি আমাদের মায়ের মতো ভালোবাসে, তোমরাই বলো?

বন্ধুরা, শোকের মাস আগস্ট স্মরণে এবারের নবারুণ এসেছে বিশেষভাবে। তোমাদের কেমন লাগলো, লিখে জানাও নবারুণের ই-মেইল ঠিকানায় (editornobarun@dfp.gov.bd)। ডাক পাঠাতে পারো এই ঠিকানায়: সম্পাদক, নবারুণ, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর।
১১২, সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা-১০০০।

আর হ্যাঁ, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট www.dfp.gov.bd -এর প্রকাশনা অংশ থেকে নবারুণ পড়ো। facebook.com/nobarunpotrikabd সাইটে গিয়ে সংযুক্ত হও নবারুণের সাথে।

শুভেচ্ছা সবাইকে।

নিবন্ধ

০৪ ১৫ আগস্ট মহাকালের সাক্ষী/সাদত আল মাহমুদ
১০ বঙ্গবন্ধুর শিক্ষক ভক্তি/অনুপম হায়াৎ
১২ খোকার প্রথম জেল/রফিকুর রশীদ
১৫ সবার বন্ধু বঙ্গবন্ধু/তাজিয়া কবীর
১৯ শেখ রাসেলের জন্য শোকগাথা/মঈনুল হক চৌধুরী
২৩ হাসু আপার ভাইবোন: মধুর সম্পর্কে কষ্টের স্মৃতি/শাহানা আফরোজ
৩০ সেলমা লেগারলফ: কথাশিল্পে বিশ্বজয়/মোমিন মেহেদী
৩৩ পাট দিয়ে আসবাব!: তরুণ স্থপতিদের কৃতিত্ব/প্রসেনজিৎ কুমার সে
৩৫ বই আলোচনা: সুজন বড়ুয়ার শ্রেষ্ঠ কিশোর কবিতা/নুরুল ইসলাম বাবুল
৪১ চলচ্চিত্র নির্মাণের গল্প: জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০১৫
'একাত্তরের গণহত্যা ও বধ্যভূমি'/মেজবাউল হক

গল্প

২৬ কান্না/মোজাম্মেল হক নিয়োগী
২৮ মিলেমিশে থাকি/নিশাত সুলতানা
৫১ মিষ্টার বোবায় ধরা/অনিক শুভ

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কবিতা

০৫ সালাম হাসেমী
০৬ মিহির মুসাকী/শাফিকুর রাহী
১১ মো. রহমত উল্লাহ/মুস্তাফা মাসুদ
১৭ রহীম শাহ/সেলোয়ার হোসেন/আলম তালুকদার
১৮ আলমগীর কবির/আনিসুর রহমান খান/চয়ন বিকাশ শুভ্র
নাহিদ সুলতানা (মিনা)

কবিতাগুচ্ছ

২২ মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ কায়সার
২৭ সঞ্জয় দেবনাথ
৪১ জাকির হাসান/শাহার আহমেদ/মনসুর জোয়ারদার

রবীন্দ্র-নজরুল স্মরণে কবিতা

৩৭ আহসানুল হক
৩৮ শচীন্দ্র নাথ গাইন / গোলাম নবী পান্না

বর্ষার কবিতা

৩৯ জাকির হাসান / মনসুর জোয়ারদার / নাহার আহমেদ

ছোটোদের লেখা

০৭ খোকার ২০টি বছর / অর্ঘ্য দত্ত
৪৫ ঘুরে এলাম পাহাড়পুর / তানজিদ নূর রাফি
৪৯ দুরন্ত মেয়ে সুরমা / মীম নোশিন নাওয়াল খান

ছোটোদের ছড়া

০৩ জুনায়েদ তৌহিদ
৩১ মেশকাউল জান্নাত বীথি / আরিফা আক্তার
৩২ লিয়ন আজাদ / সাইদুল ইসলাম / রুকাইয়া রচনা
৪০ মো. তাসিন হোসেন / রাজিয়া সুলতানা

ছোটোদের আঁকা

৪০ আনুশেহ প্রতিভা
৬২ আমিনুল ইসলাম/আতিক লাবিব
৬৩ ফাইরুজ ওয়াসিমা ইসানা / জায়েদা ইবনাত লুবা
৬৪ মুয়াজ আবদুল্লাহ/অজাজী খান স্বাতী
৬৫ স্বর্ণা রহমান/তাহসিমা তাবাসসুম ঈশিতা

প্রতিবেদন

৫৩ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগ
সুলতানা বেগম
৫৬ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট নারী-পুরুষের সমতা
জান্নাতে রোজী
৫৮ জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এসডিজি
তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা
৬১ স্বাস্থ্য বিষয়ে টেকসই উন্নয়ন
মো. জামাল উদ্দিন

সাফল্য

৬৬ তোমাকে অভিবাদন বাংলাদেশ / সাদিয়া ইফফাত আঁখি

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের বেশিরভাগ সদস্য শহিদ হলেন। বাবা-মা ও অনেক আত্মীয়-স্বজনের সাথে হাসু আপা হারিয়ে ফেললেন ছোটো তিন ভাইকে। তিনি সবার বড়ো। ভাইবোনদের নিয়ে কী সুন্দর কাটছিল দিনগুলি! এসব নিয়েই 'হাসু আপার ভাইবোন: মধুর সম্পর্কে কষ্টের স্মৃতি' পড় পৃষ্ঠা **২৩ - ২৫**

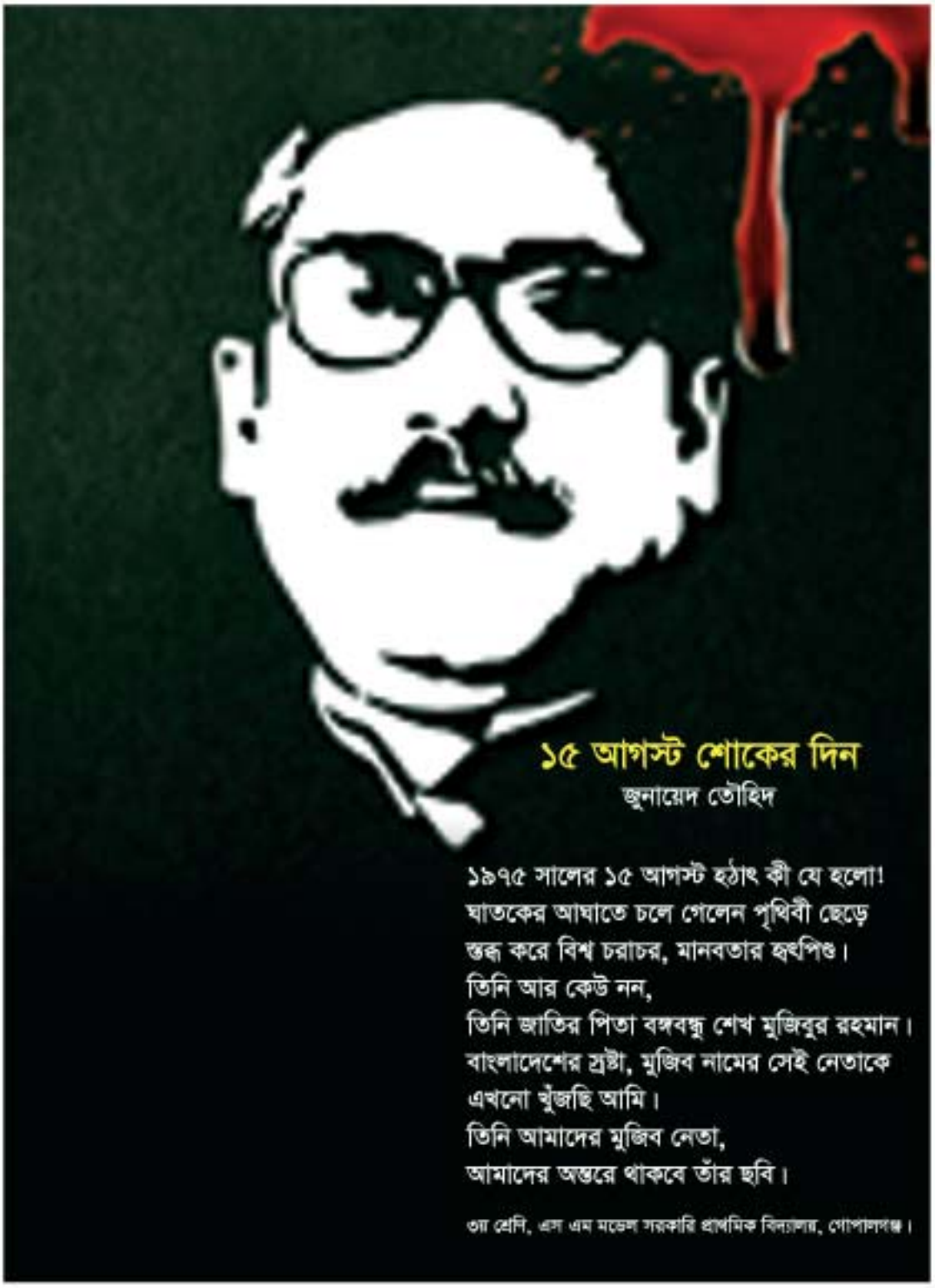

১৫ আগস্ট শোকের দিন

জুনায়েদ তৌহিদ

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হঠাৎ কী যে হলো!
ঘাতকের আঘাতে চলে গেলেন পৃথিবী ছেড়ে
স্তব্ধ করে বিশ্ব চরাচর, মানবতার হৃৎপিণ্ড।
তিনি আর কেউ নন,
তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
বাংলাদেশের স্রষ্টা, মুজিব নামের সেই নেতাকে
এখনো খুঁজছি আমি।
তিনি আমাদের মুজিব নেতা,
আমাদের অন্তরে থাকবে তাঁর ছবি।

৩য় শ্রেণি, এস এম মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ।

জাতীয় শোক দিবস

১৫ আগস্ট মহাকালের সাক্ষী

সাদত আল মাহমুদ

বাংলার সোনার মাটিতে একাধিক সোনার ছেলের জন্ম হয়েছে। শেরে-বাংলা এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা ভাসানী, মওলানা ইব্রাহীম খাঁ সহ অসংখ্য সোনার মানুষের জন্ম হয়েছিল এই সোনার বাংলায়। এ সকল জন্ম নেওয়া সোনার মানুষেরা ইতিহাসের পাতায় নিজেদের নাম দীর্ঘ সময়ের জন্য দখলে রাখবে। অবশ্য এটা তাঁরা তাঁদের যোগ্যতার বলেই করবে। কিন্তু হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালির তকমাটি শোভা পাবে শুধুমাত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ললাটে। হ্যাঁ, এখানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কথাই বলা হচ্ছে। তিনিই হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি।

১৯২০ সালে ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ার এক মুসলিম পরিবারে জাতির পিতার জন্ম হয়। প্রাইমারি স্কুলের গণ্ডি পার হওয়ার পর থেকেই কিশোর মুজিবুরের চিন্তা-চেতনার মধ্যে গভীর নেতৃত্বের ভাব ফুটে উঠে। তার প্রতিটি কাজে, চলনে-বলনে নেতৃত্ব দেওয়ার প্রবণতা সবার নজরে আসে। পরের ইতিহাস সকলের জানা। ১৯৪৬ সালের ভয়াবহ দাঙ্গার সময়ে, ইসলামিয়া কলেজের অর্থনীতির শিক্ষক ভবতোষ দত্ত কে যে কজন ছাত্র মুসলমান এলাকা পার করে হিন্দু অঞ্চলের সীমান্তে পৌঁছে দেন তাদের দলনেতা ছিলেন বঙ্গবন্ধু। এই ঘটনাই প্রমাণ করে, তিনি দলনেতা হিসেবে কতটা পারদর্শী ছিলেন।

বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের পটভূমি ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাস থেকেই। ১৯৪৮ সালে কায়দে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকায় এসে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করলে বাঙালি জনতা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। ১৯৫২ সালে এই চিত্র চরম আকার ধারণ করে। ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়েই ১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করে। এক পর্যায়ে নানা অজুহাতে জেনারেল ইয়াহিয়া খান, ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতা দখল করে দীর্ঘ ১১ বছর স্বৈরশাসন চালু রাখেন।

এরপর শুরু হয় ১৯৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থান ও ১৯৭০-এর নির্বাচন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে ৩১৩টি আসনের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ ১৬৯টি আসন লাভ করেন। জুলফিকার আলী ভুট্টো শেখ মুজিবুর রহমানের পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার বিরোধিতা করে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঢাকায় ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ পূর্ব নির্ধারিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন কোনো কারণ ছাড়াই ১৯৭১ সালে ১ মার্চ বাতিল করেন। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বাতিল করায় তীব্র প্রতিবাদে ঢাকা পরিণত হয় মিছিলের নগরীতে। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের শাসকচক্রের চালাকি বুঝতে পেরে ৭ মার্চ সোহ্‌রাওয়ার্দীর বিশাল ময়দানে সমাবেশ ডাকেন। প্রায় দশ লক্ষাধিক লোকের বিশাল সমাবেশে সকলকেই স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত থাকতে বলে বলেন, এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

বঙ্গবন্ধুর এই ঐতিহাসিক ভাষণের মধ্য দিয়ে সকলেই বুঝে নেয়, দেশকে শত্রু মুক্ত করার জন্য সবাইকে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য আহ্বান করছে। এরপর পাকিস্তানি শাসকদল ২৫ মার্চ রাতেই ঢাকাসহ দেশের বিভাগীয় ও জেলা শহরগুলোতে অপারেশন সার্চ লাইট চালায়। এই অপারেশন সার্চ লাইটে পাকিস্তানি হানাদারবাহিনীর তাণ্ডবলীলায় ঐদিন রাতেই ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরে হাজার হাজার লোক শহিদ হন। সবচেয়ে বেশি হত্যাযজ্ঞ চলে পাকিস্তানি শাসকদের বিষ ফোঁড়া নামে খ্যাত ঢাকা শহরে।

ঐদিন রাত ১২টার পরই বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। স্বাধীনতা ঘোষণা করার কয়েক ঘন্টা পর পাক সেনাদের হাতে বঙ্গবন্ধু বন্দি হন। ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে দুদিন রাখার পর বঙ্গবন্ধুকে করাচি কারাগারে নিয়ে বন্দি করা হয়। মুক্তিযুদ্ধ ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে।

দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে পাকিস্তানিরা পরাজিত হয়ে রেসকোর্স ময়দানে ৯৩ হাজার পাকিস্তানের আর্মিসহ জেনারেল নিয়াজী ভারতীয় জেনারেল অরোরার কাছে

আত্মসমর্পণ করেন। এরপর পাকিস্তান শাসকদল বহির্বিশ্বের চাপের কাছে মাথা নত করে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেয়। ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ সকাল ৮টা ১০ মিনিটে বঙ্গবন্ধু দিল্লির পালাম বিমানবন্দরে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কমেট বিমানে অবতরণ করেন। ঐদিনই কলকাতার জনসভা স্থগিত করে বিকেলেই বঙ্গবন্ধু ঢাকায় পৌঁছেন। প্রাণের নেতাকে বরণ করার জন্য আগে থেকেই লক্ষ লক্ষ বাঙালি অপেক্ষারত অবস্থায় ছিলেন। অবশেষে বঙ্গবন্ধু জন্মভূমির মাটিতে নেমে আসলে সকলের জমানো ভালোবাসাতে সিক্ত হলেন। এরপর তিনি বাংলাদেশের শাসনভার নিজের কাঁধে তুলে নেন।

সদ্য স্বাধীন হওয়া যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে অসংখ্য সমস্যা, অর্থের অভাব। তা সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দেশটি সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। বঙ্গবন্ধু এক এক করে ১৯৭২, '৭৩, '৭৪ সফলতার সাথে পার করে ১৯৭৫-এর মধ্য আগস্ট পর্যন্ত চলে আসে।

হঠাৎ কী হলো! ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ভোর রাতে বিপথগামী কিছু সেনা সদস্য বঙ্গবন্ধুর ৩২ নম্বর রোডের বাড়িতে আক্রমণ চালায়। মেজর এ কে এম মহিউদ্দিনের নেতৃত্বে কয়েকজন সেনা সদস্য ঘিরে ধরে বাঙালির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান শেখ মুজিবুর রহমানকে। মেজর মহিউদ্দিনকে বঙ্গবন্ধু চড়া স্বরে ধমক দিয়ে এসবের কারণ জানতে চান। প্রশ্ন করেন-তোরা কী চাস? কোথায় নিয়ে যাবি আমাকে? কী করবি? বেয়াদবি করছস কেন?

বঙ্গবন্ধুর মতো ব্যক্তিত্বের এ প্রশ্নের মুখে মহিউদ্দিন দারুণ ঘাবড়ে যায়। বঙ্গবন্ধু কথা বলতে বলতে সিঁড়ির কয়েক ধাপ নামতেই নিচের দিক থেকে ৭-৮ ফুট দূরে অবস্থানকারী দুই ঘৃণ্য ঘাতক মেজর নূর চৌধুরী ও মেজর বজলুল হুদার স্টেনগান থেকে বেরিয়ে আসে ১৮টি তাজা বুলেট। সিঁড়ির ধাপে গড়িয়ে পড়েন বঙ্গবন্ধু। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটে চলে সিঁড়ি বেয়ে।

এরপর এক এক করে শেখ কামাল, শেখ জামাল, বেগম মুজিব এবং সবশেষে ছোট্ট রাসেলকেও হত্যা করে শত্রুর দল। ভাগ্যক্রমে বঙ্গবন্ধুর দুই সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা প্রবাসে থাকার কারণে প্রাণে বেঁচে যান।

বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবদ্দশায় বার বার গ্রেফতার হয়ে মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য জেল খেটেছেন। তিনি বাংলাদেশ স্বাধীন করলেন, দেশের মানুষের সেবা করার মধ্য দিয়ে একটু স্বস্তির নিশ্বাস নেওয়ার আশায় দেশ শাসনের দায়িত্ব কাঁধে নিলেন। কিন্তু চার বছর না যেতেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার শত্রুদের ষড়যন্ত্রে বঙ্গবন্ধু শহিদ হলেন। দীর্ঘদিন জেল-জুলুম-নির্যাতন-অত্যাচারের বিনিময়ে দেশকে স্বাধীন করার পুরস্কার কি বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সকলের জীবন প্রদীপ নিভিয়ে দেওয়া?

এই প্রশ্ন তোমাকে ভাবতে বাধ্য করবে, জানি। প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবে বাংলাদেশের ইতিহাসের তথ্যগুলো জানলেই। বুঝতে পারবে, তুমি কী হারিয়েছ! আমরা কী হারিয়েছি!

১৫ আগস্টের সেই ভয়াল কালরাত্রি শুধু ইতিহাসের সাক্ষী নয়, এই রাত মহাকালেরও সাক্ষী হয়ে থাকবে সারাজীবন।

শোকের দিন

সালাম হাসেমী

পনেরো আগস্ট শোকের দিবস বাঙালির বুক জুড়ে,
হৃদয় বেদনার বীণা বাজে করুণ সুরে।
এই দিবসেই পরিবারসহ শহিদ জাতির পিতা,
অভাগা এ জাতির রচিত হলো অমর শোক গাথা।
জাতির পিতার বিশ্বাস ভাঙে সব ঘাতকের দল,
ধানমন্ডিতে সেদিন বহাল রক্তের মহা ঢল।
এই দিন এলে শোকের ছায়ায় ভরে বাংলার বুক,
বেদনার কালো ছায়ায় যায় না দেখা সূর্যের মুখ।
বাতাসে বাতাসে যায় শোনা যায় ব্যথার করুণ সুর,
ব্যথা নিয়ে তারা ধীরে বয়ে চলে অনেক অনেক দূর।
বনে বনে পাখি বেদনার সুরে গাইছে শোকের গান,
ব্যথায় ব্যথায় ভরে গেছে আজ সারা বনানির প্রাণ।
তটিনী বইছে ধীরে ধীরে আজ তুলে বেদনার ঢেউ,
নেই নেই সুখ মাঝিদের মনে বৈঠা বায় না কেউ।
এ শোকে জাতি নুইয়ে পড়েছে জাতির পিতার জন্য,
আবার সবাই ফিরে পেলে তাঁকে জীবন করত ধন্য।

গভীর শোকের মাস

মিহির মুসাকী

আগস্ট হলো গভীর শোকের মাস
বুকের ভেতর দুখের বসবাস।

তাই তো বলি, দূর আকাশের মেঘ
তোমরা আমার বোঝো না আবেগ?

নদী হয়ে রক্তধারা বয়,
ফিসফিসিয়ে সবাই কথা কয়।

হারিয়ে গেছে অনেক তাজা প্রাণ,
কষ্টে সবাই তাই তো মুহ্যমান।

শিশির ঝরে পাতাতে টুপটাপ,
আগস্ট এলে সকলে চুপচাপ।

কে যে এমন করল সর্বনাশ?
বয় নীরবে থমথমে বাতাস।

আগস্ট মাসে বুকের পাশে তাই
জবার মতো একটা ক্ষত ভাই।

সূর্য তাপস হাসে

শাফিকুর রাহী

ধানমন্ডি আর টুঙ্গিপাড়ার মধুমতির কোলে,
শান্ত নিবিড় শ্যামল গাঁয়ে শোকেরই ঢেউ দোলে!
রক্ত রঙিন ফুলে ঘেরা লাখো মানুষের ভিড়;
দাঁড়িয়ে তোমার সমাধিতে শ্রদ্ধানত শির!
চন্দ্র-সূর্য রাতের জোনাক কাঁদল বারো মাসে,
সকাল-বিকাল, রাত্রি-দুপুর শোকবারিতে ভাসে!

আগস্ট এলেই থমকে দাঁড়ায় জীবনের পাঠশালা,
শোকাশ্রুতে ভাসল মা গো-বুবুর হাতের বালা।
তোমার অমর কীর্তি গাথা বিশ্ব লোকালয়ে;
স্বমহিমায় বিবৃত হয় আজো সকল ভয়ে-
জনক তুমি ঘুমিয়ে আছো লক্ষ তারার পাশে
স্বদেশের মানচিত্র জুড়ে তোমার স্বপ্ন ভাসে।

প্রাণের টানে ছোটে মানুষ টুঙ্গিপাড়া গাঁয়,
শিল্পী কবি-ছবি আঁকেন মহৎ মহিমায়।
জগৎ জোড়া খ্যাতি তোমার বাংলাদেশের প্রাণ,
জুলিওকুরি বিশ্বশান্তির পেলে যে সম্মান।
সুদীর্ঘ যার আত্মত্যাগের অমর ইতিহাসে
আজও তোমার কণ্ঠ বাজে আকাশে-বাতাসে।

আগস্ট এলেই নত শিরে শ্রদ্ধা জানায় জাতি,
পিতার শোকে কোন সে রাখাল কাঁদল সারারাতি?
আকাশ-বাতাস নতশিরে তোমার সমাধিতে
ঢেউয়ের তালে শ্রদ্ধা জানায় পদ্মা-জলধিতে।
দিন হয়ে যায় রাত্রি মা গো মধ্য আগস্ট মাসে,
বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন-স্বদেশ শোকাশ্রুতে ভাসে।

চির বিস্ময় তোমার খ্যাতি- বিশ্ব পারাবারে,
ফুলেল বৃক্ষ সবুজ ঘেরা সারথির মাজারে।
ব্যথার বিলাপ দুঃখ ভুলে বাঁধনহারা রাহী-
শোকের বসন জড়িয়ে গায়ে পিতার গান গাহি।
মহৎ মহান মৃত্যুঞ্জয়ী কালের ইতিহাসে,
দেশের দুশমন পরাজিত-সূর্য তাপস হাসে।

খোকার ২০টি বছর

অর্ঘ্য দত্ত

প্রতি বছর আগস্ট মাস এলেই ১৯৭৫ সালের সেই ভয়াবহ ১৫ আগস্ট-এর কথা মনে পড়ে যায়। জাতির হৃদয় থেকে জাতির পিতার স্মৃতি মুছে দেওয়ার সেই অপকৌশলের কথা মনে হলে এখনো আমরা শিউরে উঠি। না, আজ সেই দুঃসহ কালরাতের কথা বলব

না। বরং তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু সময় কেমন ছিল, সেটাই জানার চেষ্টা করব।

ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রাম। সেখানে ছোটো ছোটো ইটের তৈরি দালান আর টিনের ঘর। শেখ বংশের সেই টিনের বাড়িতেই ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ খোকার জন্ম। ডাক নাম 'খোকা', ভালো নাম মুজিব, শেখ মুজিবুর রহমান। গ্রামের সাধারণ পরিবারের আর দশটা শিশুর মতো অতি সাধারণ পরিবেশে খোকা বড়ো হয়েছেন ঠিকই, কিন্তু তিনি ছিলেন সবার চেয়ে আলাদা। ছেলেবেলা থেকেই সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর গভীর মমতা, সত্য কথা বলার সাহস ছিল তাঁর অসাধারণ। টুঙ্গিপাড়ায় শেখ পরিবারের গোড়াপত্তন করেছিলেন শেখ বোরহানউদ্দিন নামে এক ধার্মিক পুরুষ। এই বংশের শেখ কুদরতউল্লাহকে নিয়ে একটি গল্পও আছে। সে সময় ইংরেজ কুঠিয়াল মি. রাইন মাঝিদের বেকায়দায় ফেলে তাদের নীলকুঠিতে কাজ করাতো। এ নিয়ে হাইকোর্টে মামলা হয় আর রাইনের অপরাধ প্রমাণিত হয়। তখন কুদরতউল্লাহকে ক্ষতিপূরণ চাওয়ার সুযোগ দেওয়া হলে তিনি রাইনকে অপমান করার জন্য মাত্র 'আধা পয়সা' জরিমানা দাবি করেছিলেন। অর্থাৎ আত্মমর্যাদাবোধ এই পরিবারের রক্তের সাথে মিশেছিল। তাই ইংরেজ কুঠিয়াল, স্থানীয় জমিদার এবং প্রতাপশালী প্রতিবেশী কারো কাছেই শেখ পরিবারের কেউ কখনো মাথা নত করেনি।

খোকার ছোটো দাদা শেখ আবদুর রশিদ এক সময় ইংরেজদের দেওয়া 'খান সাহেব' উপাধি পেয়েছিলেন। খোকা বড়ো হয়ে আরো অনেক বড়ো উপাধি পেয়েছিলেন, 'বঙ্গবন্ধু'। এই উপাধি তাঁকে দিয়েছিল দেশের সাধারণ মানুষ। পরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিকে স্বাধীনতা উপহার দিয়ে 'জাতির পিতা' হিসেবে মর্যাদা লাভ করেন। সেই গৌরবের ইতিহাস অনেকেরই জানা। তাই সে পথে না গিয়ে আমরা কেবল তাঁর জীবনের ২০টি বছর নিয়ে কথা বলব। কারণ এই সময়টিই যে-কোনো মানুষের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সময়!

ছেলেবেলায় গরিব সহপাঠী খালি গায়ে শীতে কষ্ট পাচ্ছে দেখে নিজের চাদরটি তাকে দিয়ে দেওয়া কিশোর মুজিবের কাছে কোনো ব্যাপারই ছিল না। আবার একটু বড়ো বয়সে গ্রামের গরিব মানুষ খেতে পাচ্ছে না দেখে সে তাঁর বাড়ির ধানের গোলা তাদের জন্য খুলে দিয়েছিল। ১৯৩৪ সালে মুজিব যখন সপ্তম শ্রেণির ছাত্র তখন তাঁর বেরিবেরি রোগ ধরা পড়ে। বাবা শেখ লুৎফর রহমান চিকিৎসার জন্য তাকে কলকাতায় নিয়ে যান। দীর্ঘ চিকিৎসার পর কলকাতায় তাঁর চোখে অস্ত্রোপচার করা হয়। আর সেই থেকে চশমা ওঠে মুজিবের চোখে।

চোখের চিকিৎসার পর কিশোর মুজিব তৎকালীন মাদারিপুর ফিরে আসে। সারা দেশে তখন ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বদেশি আন্দোলন চলছে। স্বদেশি আন্দোলনের নেতারা বিভিন্ন জায়গায় গোপনে সভা করতেন। মুজিবও হাজির হতো সেই সভাতে। ১৯৩৭ সালে তাঁকে গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে ভর্তি করা হলো। কাজী আবদুল হামিদকে রাখা হলো গৃহশিক্ষক হিসেবে। 'মুসলিম সেবা সংগঠন' নামে শিক্ষকের একটি সাহায্য সংগঠন ছিল। মুজিব সেই সংগঠনের জন্য মুষ্টিভিক্ষার চাল সংগ্রহ করে দিত। খেলাধুলাতেও প্রচণ্ড আগ্রহ ছিল তাঁর। ফুটবল, ভলিবল ও হকি সবই প্রিয় খেলা। স্কুল দলের খেলোয়াড় হিসেবেও বেশ নাম-ডাক ছিল তাঁর।

১৯৩৮ সালে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক প্রধানমন্ত্রী এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী শ্রমমন্ত্রী ছিলেন। তাঁরা গোপালগঞ্জে আসবেন, তাঁদের সংবর্ধনা দেওয়ার দায়িত্ব পড়ল মুজিবের ওপর। মুজিব সবাইকে নিয়ে সংবর্ধনার দল গড়লেন। কিন্তু তৎকালীন কংগ্রেস মুসলিম লীগের মন্ত্রিসভাকে ভালো চোখে দেখেনি। তাই হিন্দু ছেলেরা মুজিবের সংবর্ধনা দল থেকে সরে গেল। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই মুজিব পিছু হটবার নয়। বরং ভালোভাবেই সংবর্ধনা হলো। হোসেন শ হ ী দ

সোহরাওয়ার্দী মুজিবের নাম ঠিকানা লিখে নিলেন। পরে তাঁর সাথে মুজিবের চিঠি আদান-প্রদানও হয়।

একদিন ফুটবল খেলে ঘরে ফেরার পথে শোনা গেল, মালেককে স্থানীয় এক রাজনৈতিক নেতার বাড়িতে ধরে নিয়ে মারধর করা হচ্ছে। মুজিব ছুটে যান সেখানে। প্রতিপক্ষের সাথে মারামারি করে মালেককে ফিরিয়ে আনা হয়। কিন্তু এই ঘটনায় মুজিব এবং তার সঙ্গীদের খুনের আসামি করে তাদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয় আদালতে। বাবা শেখ লুৎফর রহমান জানতেন, তাঁর ছেলে কখনো অপরাধ করতে জানে না। তবুও আইনি সহায়তার জন্য ছেলের পাশে দাঁড়ালেন। অবশেষে ৭ দিন জেল খেটে জামিন মিলল। পরে অবশ্য আপোশ মীমাংসার মধ্যদিয়েই সে মামলা শেষ হলো। কিন্তু এভাবেই মুজিবের জেল জীবনের সূচনা। পরবর্তী সময়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর দীর্ঘ জেল জীবনের কথা স্মরণ করে নিজেই একটি গল্প বলেছিলেন। আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আর তাঁর ভাই শিশু শেখ কামাল একদিন খেলা করছিলেন। কিশোরী শেখ হাসিনা কিছুক্ষণ পরপর খেলা ফেলে এসে 'আব্বা-আব্বা' বলছিল। শিশু শেখ কামাল কিছু বুঝে ওঠার আগেই বঙ্গবন্ধুকে জেলে যেতে হয়েছে। তাই বাবা কাকে বলে সে জানে না। তাই বড়ো বোন শেখ হাসিনাকে সে বলছিল, 'হাচু আপা, হাচু আপা, তোমার আব্বাকে আমি একটু আব্বা বলি।'

১৯৩৯ সালে মুজিব কলকাতা যান। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে দেখা করেন এবং গোপালগঞ্জে মুসলিম লীগ গঠন করেন। তিনি হন সেখানকার সম্পাদক। এভাবে তিনি আস্তে আস্তে নিজেকে রাজনীতিতে জড়াতে শুরু করেন। বাবা ছেলের রাজনীতিতে কখনো বাধা দিতেন না, শুধু বলতেন পড়াশুনাটা চালিয়ে যেতে হবে। পড়াশুনার পাশাপাশি মুজিব তখন অনেক ভালো খেলোয়াড়ও। বাবা শেখ লুৎফর রহমানও খেলা ভালোবাসতেন। তাঁর নিজের দলও ছিল। মুজিব বাবার দলের বিপক্ষে ফুটবল খেলতেন। ১৯৪০ সালে মুজিবের দল প্রায় সব খেলাতেই বাবার দলকে হারিয়ে দেয়। বছরের শেষ খেলায় ৫বার ড্র হয়। মুজিবের দলের সবাই ছাত্র খেলোয়াড়। খেলায় বারবার ড্র করে তিনিও অনেক ক্লান্ত। পরের দিন পরীক্ষা। স্কুলের প্রধান শিক্ষক এসে বলে গেলেন, শেখ লুৎফর রহমানের দলের কাছে তাদের পরাজয় মেনে নিতে হবে। মুজিব শিক্ষকের অবাধ্য হননি কখনো। তাই প্রধান শিক্ষকের আদেশ মেনে নিয়ে 'এ জেড খান শিল্ডের' শেষ ফাইনাল খেলায় বাবার দলের কাছে ১ গোলে পরাজিত হলেন। সম্ভবত এই একবারই প্রধান শিক্ষকের আদেশ মেনে মুজিব বাবা শেখ লুৎফর রহমানের ফুটবল দলের কাছে নিজের পরাজয় মেনে নিয়েছিলেন।

৮ম শ্রেণি, সেন্ট গ্রেগরি হাই স্কুল, ঢাকা।

বঙ্গবন্ধুর শিক্ষক ভক্তি

অনুপম হায়াৎ

জাতির পিতা, মহান নেতা 'বঙ্গবন্ধু' শেখ মুজিবুর রহমানের মহানুভবতার কথা অনেকেরই জানা। তিনি যেমন ছিলেন সাধারণ মানুষের বন্ধু তেমনি ছিলেন শিক্ষক সমাজেরও বন্ধু।

বঙ্গবন্ধু পারিবারিক পরিবেশ থেকে শুরু করে প্রাইমারি স্কুল, হাই স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত অনেক শিক্ষকের কাছে লেখাপড়া করেছেন। ছাত্রজীবনে যেমন ছিলেন সাহসী, পরোপকারী, নেতৃত্বদানকারী, তেমনি ছিলেন বিনয়ীও। এ কারণে সব শিক্ষকরাই তাঁকে স্নেহ করতেন এবং চিনতেনও। শিক্ষকদের প্রতি বঙ্গবন্ধুর ভালোবাসা এবং ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। তাঁর লেখা 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী', তাঁর পড়ার সাথি, খেলার সাথি ও অন্যান্য সূত্রে তাঁর শিক্ষক-ভক্তির বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে জানা যায়। শিক্ষকদের প্রতি বঙ্গবন্ধুর শ্রদ্ধা প্রদর্শনের ঘটনা ইতিহাসের সোনালি অধ্যায় হয়ে আছে। এসব ঘটনা হয়ত কেউ জানে, কেউ জানে না।

কিশোরকালের ঘটনা

বঙ্গবন্ধুর প্রাথমিক শিক্ষাজীবন শুরু হয় পারিবারিক পরিবেশে তাঁর পিতা শেখ লুৎফর রহমান ও মাতা সায়ারা বেগমের তত্ত্বাবধানে। পিতা শেখ লুৎফর রহমান ছিলেন সরকারি কর্মকর্তা ও সচেতন ব্যক্তি। তিনি আদরের পুত্র খোকার (বঙ্গবন্ধুর পারিবারিক নাম) জন্য বাড়িতে তিনজন শিক্ষক রেখেছিলেন। একজন ইসলাম ধর্ম শিক্ষার জন্য মৌলভী সাহেব, দ্বিতীয়জন সাধারণ শিক্ষার জন্য পণ্ডিত সাখাওয়াত উল্লাহ পাটোয়ারী, তৃতীয়জন কাজী আবদুল হামিদ। বঙ্গবন্ধু মৌলভী সাহেবের কাছে আমপারা আর পণ্ডিত সাখাওয়াত উল্লাহর কাছে বাংলা বর্ণমালা ও নামতা পড়তেন এবং কাজী আবদুল হামিদের কাছে পড়তেন কবিতা-গল্প ইত্যাদি।

শিক্ষক সাখাওয়াত উল্লাহ পাটোয়ারী সম্পর্কে জানা যায়, তিনি ছিলেন বঙ্গবন্ধুর নিকট আত্মীয়। খেলাধুলা ও পড়ার সাথি শেখ আশরাফুল হক ওরফে আমিন মিয়া (১৯১৪-২০০৯ সূত্রে) ছিলেন বঙ্গবন্ধুর চাচা এবং মামাও। তাঁরা একই সঙ্গে পড়তেন সাখাওয়াত উল্লাহ পাটোয়ারীর কাছে। বঙ্গবন্ধু শিক্ষক ও মুরুব্বীদের খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করতেন। সাখাওয়াত উল্লাহ পাটোয়ারীর বাড়ি ছিল নোয়াখালীতে। তিনি বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে লজিং থাকতেন। লেখাপড়ার ব্যাপারে তিনি খুবই কঠোর ছিলেন। জিজ্ঞাসিত কোনো প্রশ্নের জবাব না দিতে পারলে তিনি ছাত্রদের নানাভাবে শাস্তি দিতেন। একবার অসুস্থ অবস্থায় পড়া না দিতে পারায় পাটোয়ারী স্যার খুব জোরে থাপ্পর মারলে কিশোর মুজিব মাটিতে পড়ে গেলেও শিক্ষকদের প্রতি কোনোরূপ বেয়াদবি আচরণ করেননি। শিক্ষকের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ছাত্র মুজিব শ্রদ্ধা ও মান্যতার সঙ্গে মেনে নিয়েছিলেন। কিছুদিন পর পাটোয়ারী স্যার অন্যত্র চলে যাওয়ার সময় তাঁর বিছানাপত্রের গাঁটটি নিজের মাথায় করে পাটগাতি পৌঁছে দিয়েছেন মুজিব। শিক্ষকের প্রতি এমনি ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিল কিশোর মুজিবের।

> **'আমার সবচেয়ে বড়ো শক্তি আমার দেশের মানুষকে ভালোবাসি, সবচেয়ে বড়ো দুর্বলতা আমি তাদেরকে খুব বেশি ভালোবাসি।' – বঙ্গবন্ধু**

প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন ঘটনা (১৯৭২)

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর কার্যালয় গণভবনের গেটে দুজন অতিথি অপেক্ষা করছেন। এদের একজন টুঙ্গিপাড়া গিমাডাঙ্গা প্রাইমারি স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক বেজেন্দ্রনাথ সূত্রধর। আরেকজন একই স্কুলের ছাত্র সৈয়দ নূরুল হক। বঙ্গবন্ধু ১৯২৭ থেকে ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত গিমাডাঙ্গা প্রাইমারি স্কুলের ছাত্র ছিলেন। তখন তাঁর শিক্ষক ছিলেন বেজেন্দ্রনাথ সূত্রধর আর সহপাঠী ছিলেন পাটগাতি এলাকার সৈয়দ নূরুল হক। শিক্ষকের অনেক বয়স হয়েছে। তিনি বয়সের ভারে অনেকটাই চলতে-ফিরতে পারেন না।

বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরও সেই শিক্ষক ও সহপাঠীর কথা ভুলেননি। তিনি তাদেরকে ঢাকা আসার জন্যে খবর পাঠান। খবর পেয়ে তারা নির্দিষ্ট

দিনে গণভবনের গেটে উপস্থিত হয়ে বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করার জন্যে অনুমতি পাঠান।

বঙ্গবন্ধু খবর পেয়ে সব নিয়মকানুন উপেক্ষা করে তাঁর প্রাইমারি স্কুল জীবনের শিক্ষকের কাছে নিজেই ছুটে আসেন এবং স্যারের পায়ে ধরে সালামের পর বুকে জড়িয়ে ধরেন। গেটেই তখন অভাবনীয় দৃশ্যের সৃষ্টি হয়। অতঃপর বঙ্গবন্ধু তাঁর শৈশবের খেলার সাথি স্কুল জীবনের বন্ধুকেও জড়িয়ে ধরেন। বঙ্গবন্ধু সেই শিক্ষককে নিয়ে যান প্রধানমন্ত্রীর অর্থাৎ তাঁর অফিস কক্ষে। ওখানে সৃষ্টি হয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর বদান্যতার আরেক দৃশ্য। তিনি শিক্ষককে নিয়ে নিজের চেয়ারে বসিয়ে উপস্থিত মন্ত্রী, এমপিদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে গর্ব ভরে বলেন, 'আমার শিক্ষক'। অতঃপর বঙ্গবন্ধু তাঁর স্কুল জীবনের শিক্ষক ও সহপাঠীর নানা খোঁজখবর নেন। অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বঙ্গবন্ধু শিক্ষকের কাছে কিছু টাকা দেন তাঁর ঘর তোলার জন্য। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, এ ঘটনার পর বঙ্গবন্ধু সারাদেশের শিক্ষকদের দুর্ভোগ লাঘবের জন্য তাদের চাকরি সরকারিকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। শিক্ষকদের প্রতি বঙ্গবন্ধুর এমনি শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল অপরিমেয়।

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে গান

মো. রহমত উল্লাহ্

কী করে ভাবব বলো তুমি নেই
কী করে বলব বলো তুমি ছিলে না?
তোমায় ছাড়া এই স্বাধীনতা
ভাবা যায় না, মানা যায় না॥

খাঁচার পাখির মতো বন্দি ছিলাম
তোমার মন্ত্র নিয়ে মুক্ত হলাম।
সেই চেতনায় আজও পতাকা উড়ে
তুমি ছাড়া প্রতিবাদ ভাষা পায় না॥

আপন ঠিকানা ভুলে কাঁদতে ছিলাম
অনেক যুদ্ধ করে মা'কে পেলাম।
'বাঙালি' বলে তুমি ডাক না দিলে
আমি আর আমাকেই জানা হতো না॥

[বঙ্গবন্ধুর প্রতি ভালোবাসা নিয়ে গাইতে পারো তুমিও]

মুজিবুর মুজিবুর

মুস্তাফা মাসুদ

জাতির পিতা তুমি মুজিবুর,
তুমি বাঙালির স্বপ্ন-মুকুর
তোমারি দেখানো পথ ধরে আজও
হাঁটি দূর–বহুদূর।

বাংলার মাঠ
বাংলার ঘাট
বাংলার নদী আর মেঠোপথ
সবার কণ্ঠে সবখানে বাজে
হৃদয় জুড়ানো সে-মোহন সুর;
তারি মাঝে শুনি নামটি তোমার
মুজিবুর মুজিবুর!

তুমি মুজিবুর
স্বপ্ন মধুর!
কোটি বাঙালির ইচ্ছের সাথে
আজও মিশে আছো সুখে আর দুঃখে,
হাতছানি দেয় রোদেলা সুদূর;
সেই ইশারায় সবারই হৃদয়
আশ্বাসে ভরপুর–
মুজিবুর মুজিবুর!

সেই এক নাম
অমর সে-নাম
এ-দেশের সব মানুষের বুকে
রবে অমলিন, চির-অম্লান;
সব দ্বিধা-ভয় হয়ে যায় দূর
তোমারি সাহসে পার হব ঠিক
বাধার সমুদ্দুর–
মুজিবুর মুজিবুর!

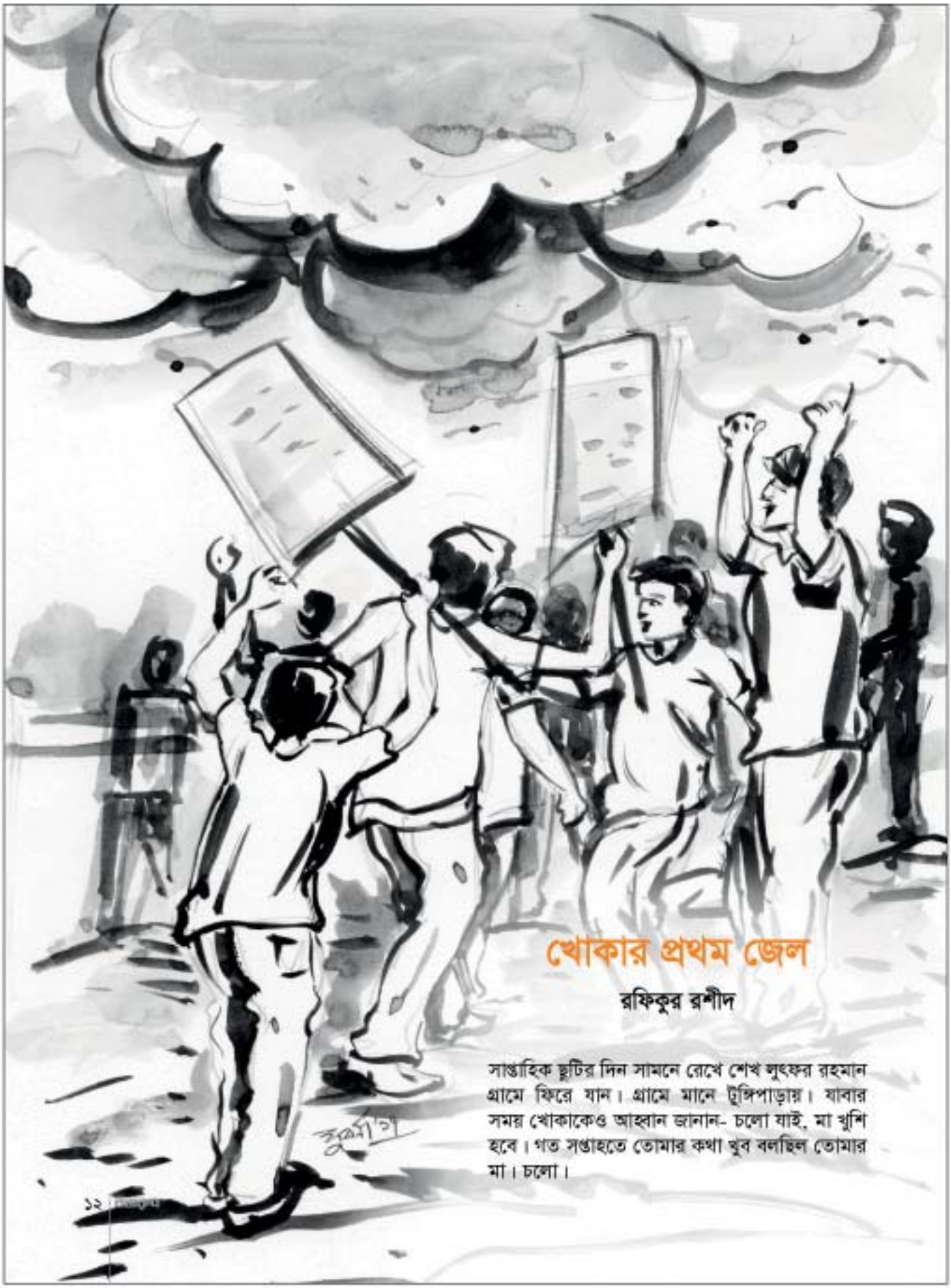

খোকার প্রথম জেল

রফিকুর রশীদ

সাপ্তাহিক ছুটির দিন সামনে রেখে শেখ লুৎফর রহমান গ্রামে ফিরে যান। গ্রামে মানে টুঙ্গিপাড়ায়। যাবার সময় খোকাকেও আহ্বান জানান- চলো যাই, মা খুশি হবে। গত সপ্তাহতে তোমার কথা খুব বলছিল তোমার মা। চলো।

খোকারও বেশ মনে পড়ে মায়ের কথা। বাবার সঙ্গে মাদারীপুরে থাকার সময় ঘন ঘন যাওয়া হতো বাড়ি। তখন দেখা যেত- মা ঠিকই বাড়ির বাইরে আমতলায় দাঁড়িয়ে আছেন। এ তাঁর অনেক পুরানো অভ্যেস। খোকা যখন গিমাডাঙ্গা প্রাইমারিতে পড়তো, তখন উনি বিকাল হলেই আমতলায় এসে দাঁড়িয়ে থাকতেন দেখেছে মাকে। খোকাকে নাগালের মধ্যে পেলে আঁচলে জড়িয়ে ঘরে নিয়ে যাবে, নিজের হাতে দুধ-কলা মেখে ভাত খাওয়াবে। মায়ের এ অভ্যাস একটুও বদলায়নি খোকা জানে। এখন শনিবার সন্ধ্যায় পথ চেয়ে থাকে- বাবার সঙ্গে খোকাও যদি আসে!

কিন্তু এই গোপালগঞ্জ মিশন ইশকুলে ভর্তি হবার পর খোকার কতরকম কাজ বেড়েছে সে কথা মাকে বুঝাবে কী করে! এমনিতে অসুখবিসুখে পিছিয়ে গেছে তিন চার বছর, লেখাপড়ার চাপ তো আছেই, সেইসঙ্গে জুটেছে আরো হরেকরকম কাজ। ফুটবল মাঠে মিশন ইশকুলের ক্যাপ্টেন কে? মুসলিম সেবা সমিতির সাধারণ সম্পাদক কে? স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধান উদ্যোক্তা কে? উত্তর একটাই-মুজিবুর রহমান। খোকারই পূর্ণ নাম শেখ মুজিবুর রহমান। এত সব কাজকর্ম ফেলে তাঁর বাড়ি যাওয়া হয়ে ওঠে না। প্রায় প্রতি সপ্তাহে বাবা আহ্বান জানান-চলো, বাড়ি থেকে ঘুরে আসি। খোকার তো অজুহাতের শেষ নেই, কৌশলে ঠিকই বাবার প্রস্তাব নাকচ করে দেয়, ডুবে যান তার নিজের রাজ্যে।

এভাবেই চলছে কয়েক বছর। এরমধ্যে খোকা যে মোটেই বাড়ি যান না, মায়ের সঙ্গে দেখা করে না, ব্যাপারটা এমনও নয়। বাড়ি যাবার সময় করে উঠতে পারলেই তিনি যান । মায়ের জন্যে প্রাণ আনচান করে উঠলেই তিনি ছুটে চলে যান টুঙ্গিপাড়ায়, মায়ের মতোই প্রিয় সেই গ্রামে, খালপাড়ের ছায়াঢাকা বাড়িতে। কিন্তু সাপ্তাহিক সব ক'টা ছুটির দিনে যাওয়া হয় না, মানে হয়ে ওঠে না। বাবা ঠিকই বাড়ি যান, যাবার আগে ছেলেকে ডাকেন- চলো যাই ঘুরে আসি।

এদিকে কর্মব্যস্ত পুত্র নানান কৌশলে বাবার প্রস্তাব পাশ কাটিয়ে যান। বাসা থেকে বেরিয়ে যাবার সময় বাবা বিশেষভাবে মনে করিয়ে দেন, কারো সঙ্গে গোলমাল করো না যেন।

গুড বয়ের মতো ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানান খোকা।

মনে মনে তিনি নিজের মতো করে হিসাব মিলান-কিসের গোলমাল! কার সঙ্গে গোলমাল করি আমি! মাথায় আমার শিং গজিয়েছে? আমি লোকজনকে গুঁতিয়ে বেড়াই? আমি কি গুণ্ডাপাণ্ডা? যেখানে সেখানে গণ্ডগোল করে বেড়াই? বাড়িতে ছুটি কাটিয়ে গোপালগঞ্জে পা ফেলতে না ফেলতে কারা যে বাবার কানে উলটপালট কথাবার্তা লাগায়! তারা সামনে এসে দাঁড়াতে পারে না, আড়ালে গিয়ে যতসব কুটুসকাটুস!

বাবার তো রাগ হতেই পারে! একতরফা অভিযোগ শুনলে মেজাজ খারাপ হতে কতক্ষণ! কার কাছে কী শুনে আসেন বাবা, বাসায় ঢুকে খোকার উপরে চোটপাট।

রাতের বেলা অমুকের বাড়িতে ইট মেরেছে কে?

কী উত্তর দেবে খোকা! যারা নালিশ করেছে তাদের শুধালেই হয়! সাধ করে কেউ কারো বাড়ি ইট মারতে যায়! আবারো অভিযোগ করেন বাবা, এ হচ্ছে তোমার দলবলের কাজ।

এতক্ষণে মুখ খোলেন খোকা, মানুষ এত খারাপ হয় বাবা! এমন কৃপণ হয়! নিজে মুসলমান হয়েও আমাদের মুসলিম সেবা সমিতিতে সাহায্যে দেয় না, মুষ্টির চাল পর্যন্ত দিতে চায় না। আরো আজেবাজে কথা বলে। হামিদ স্যারকেও যদি খারাপ বলে, তাহলে সহ্য করা যায়!

তাই বলে তোমরা মানুষের উপরে জুলুম করবে?

আপনিও এ কথা বললেন বাবা! আমরা জুলুম করি? হামিদ স্যার আমাদের জুলুম করতে বলেন?

না না, আমি কী তাই বলেছি? হামিদ স্যার কোনো অন্যায় করতে পারেন না।

গৃহশিক্ষক কাজী আবদুল হামিদের প্রতি প্রবল আস্থা খোকার বাবা শেখ লুৎফর রহমানের। তিনি মনে করেন, হামিদ স্যার কোনোরকম অন্যায় করতে পারেন না, কাউকে অন্যায় করার অনুমতিও দিতে পারেন না। কাজেই এই হামিদ স্যারের দোহাই দিতে পারলে যে শতেক ঝামেলা মাফ হয়ে যাবে, খোকা এটা ভালোই জানেন। স্যারের কাঁধে মই রেখে বিপদে পাড়ি দেবার ঘটনা বহুবার ঘটেছে। আসলে অন্যায় প্রতিবাদ করা কিংবা নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করার শিক্ষণও কিন্তু বাবার কাছ থেকেই পেয়েছেন খোকা। ফলে যে যা বলে বাবা মনোযোগ দিয়ে শোনেন আর মনে মনে হিসাব মেলান- কবে যে খোকা বড়ো হবে!

গোপালগঞ্জ ছোট্ট শহর। শহরের এক প্রান্তের খবর অন্য প্রান্তে পৌঁছাতে কতটুকুই বা সময় লাগে! ছোট্ট এই শহরে তো বটেই, শহরতলির গ্রামগুলোতেও হিন্দু-মুসলমান দীর্ঘদিন থেকে পাশাপাশি বাস করছে শান্তিতে সৌহার্দ্যে। রাজনীতির ধাক্কায় সেই শান্তির নিটোল ছায়া মাঝেমধ্যে ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়। সেইবার, অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ. কে.ফজলুল হক এবং শ্রমমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর গোপালগঞ্জ আগমন উপলক্ষে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়তে গিয়ে খোকা সেটা হাড়ে হাড়ে টের পান। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ছাত্রদের নিয়েই এ বাহিনী গঠন করা হয়। কিন্তু হিন্দু ছাত্রদের অনেকেই পরে পিছুটান দিয়ে সরে পড়ে, এমন কী নেতাদের আগমন বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করেন। খোকা তখন কী করে? দলবল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাজে। কিন্তু কেন এই বিরোধিতা! কৃষক শ্রমিক পার্টি থেকে শেরে বাংলা মুসলিম লীগে যোগ দিয়েছেন, কাজেই হিন্দুরা তার সঙ্গে নেই।

তারপরও হিন্দু অধ্যুষিত গোপালগঞ্জ সে-বার মন্ত্রীরা ঠিকই এসেছেন, সভা হয়েছে, এগজিবিশন উদ্‌বোধন হয়েছে, যা যা হবার কথা, সবই সফলভাবে হয়েছে। এ সাফল্যের পেছনে স্থানীয় নেতা খোন্দকার শামসুদ্দীন আহমেদের নেতৃত্বে শেখ মুজিবের বিশাল স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী বিরাট ভূমিকা পালন করে। আশপাশের বিভিন্ন গ্রাম থেকে লোকজন লাঠি-বল্লম নিয়ে যোগ দেয় জনসভায়। মন্ত্রীর সামনে দাঁড়িয়ে শেখ মুজিব তাঁর ইশকুলের দাবিদাওয়া তুলে ধরে ঠিকই তা আদায় করে নেন। এভাবেই তাঁর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নজরে আসা। আর এত সব ঘটনার মধ্যদিয়েই টুঙ্গিপাড়ার খোকা হয়ে ওঠেন শেখ মুজিব।

মুজিব তখনো ইশকুলের ছাত্র ছাড়া আর কিছু নয়। তিনি মিশন ইশকুলে পড়েন। সহপাঠীদের চেয়ে বয়সে একটু বড়ো বলে নয়, তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতাই তাকে অন্য অনেকের চেয়ে আলাদা করেছে, বড়ো করে তুলেছে। তাই বলে ইশকুল জীবনেই জেল খাটতে হবে তাকে? অন্যায়ের প্রতিবাদ করলে এই তার পরিণতি!

হিন্দু-মুসলমানের আড়াআড়ি তখনো চলছে গোপালগঞ্জে। রাজনৈতিক হানাহানি সামাজিক সম্প্রীতিকে মাঝেমধ্যেই ভেঙে দিচ্ছে। তারই মধ্যে শেখ মুজিবের বন্ধুত্ব টিকে আছে হিন্দু-মুসলিম সবার সাথে। একদিন ফুটবল মাঠ থেকে বাড়ি ফেরার পথে জানা গেল মুজিবের বন্ধু মালেককে সুরেন ব্যানার্জির বাড়িতে ধরে নিয়ে গিয়ে মারপিট করা হয়েছে এবং আটকে রাখা হয়েছে। বাসু মিয়া নামে এক প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ বলেন, তুমিই যাও মুজিব, মালেককে ছাড়িয়ে নিয়ে এসো। তোমার সঙ্গে তো ওদের খুব ভাব!

হিন্দু মহাসভা নামের একটি রাজনৈতিক সংগঠনের সভাপতি সুরেন ব্যানার্জি। মুজিব সেখানে সদলবলে পৌঁছাতেই রমাপদ নামের এক লোক রে রে করে তেড়ে আসে, গালাগালি করে। মুজিব সোজা জানিয়ে দেন-ও সবে লাভ হবে না। মালেককে ছেড়ে দিতে হবে। নইলে কেড়ে নিয়ে যাব। এরপর আর কথায় নয়, শুরু হয় হাতাহাতি-লাঠালাঠি। রমাপদের হাতের লাঠি কেড়ে নিয়ে রমাপদকেই পেটানো হয়। মাথা কেটে রক্তপাত। তাতে কী, মালেককে ঠিকই বিজয়ীর বেশে বের করে আনেন ওদের খপ্পর থেকে।

সেই রাতেই সাজানো হয় মিথ্যা মামলা। মুজিব নাকি ছুরি দিয়ে হত্যা করতে গিয়েছিল রমাপদকে। কোর্টে দাঁড়িয়েও মুজিব প্রতিবাদ করে-ছুরি পাবো কোথায়! এ হচ্ছে লাঠির খেলা। শেষে সেই লাঠির কসরত দেখানোর অপরাধে আরো অনেকের সাথে মুজিবেরও সাত দিনের জেল হয়। আসলে জেল খাটা একে বলে না। এ হচ্ছে হাজতবাস। জামিন না দিয়ে আটকে রাখা। সাতদিন পর সেই জেল থেকে মুক্তি পাবার পর বাইরে এসেই মালেকের কাঁধে থাবা দিয়ে মুজিব বলেন তোর জন্যে নতুন জীবনের স্বাদ পেলাম দোস্ত। শুরু হলো নতুন জীবন।

মালেকের চোখ ভিজে আসে। গড়িয়ে পড়ে দু ফোঁটা অশ্রু। মুজিবের কন্ঠে সহাস্য সান্ত্বনা-কাঁদছিস কেন গাধা। আরো কত জেল খাটতে হবে তার ঠিক আছে!

সবার বন্ধু বঙ্গবন্ধু

তাজিয়া কবীর

১৯২০ সালের ১৭ মার্চ। ফরিদপুরের গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রামের শেখ পরিবারে এক শিশুর জন্ম হয়। শিশুটির বাবার নাম শেখ লুৎফর রহমান, মায়ের নাম সায়ারা খাতুন। মা-বাবা শিশুটিকে ডাকেন খোকা বলে।

আস্তে আস্তে খোকা বড়ো হতে থাকে। হালকা-পাতলা গড়ন, ছিপছিপে লম্বা দেহ। ফুটবল খেলতে ভালোবাসে। কিন্তু দেখলে মনে হয়, ফুটবলে লাথি দিতে গিয়ে নিজেই বুঝি পড়ে যাবে। তবুও খেলার সাথিদের নিয়ে বল হাতে মাঠে নামতেই হবে।

খেলার নেশাটা পেয়েছেন বাবার কাছ থেকেই। বাবা নিজেও ভালো ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন। মাঝে মাঝে বাবা-ছেলে মিলে মাঠে নেমে পড়তেন বল খেলতে।

গ্রামেরই এক স্কুলে ভর্তি করানো হলো খোকাকে। বাড়িতেও শিক্ষক রাখা হলো বাংলা, ইংরেজি, অংক পড়ানোর জন্য। আরবি পড়াতেন আরেক শিক্ষক, বাড়িতে এসে। খোকার কেবল খেলায় মন। বাবা চাকরি করেন গোপালগঞ্জ আদালতে সেরেস্তাদার পদে। তিনি ছেলেকে নিজের কাছে নিয়ে এলেন। ভর্তি করলেন তৃতীয় শ্রেণিতে। আদালতে বাবা দেখেন উকিলদের খুব সম্মান, খুব প্রতিপত্তি। আর তাই বাবার খুব ইচ্ছে, ছেলে বড়ো হয়ে আইনজীবী হবে। আল্লাহ্ পাকের কাছে হাত তুলে মোনাজাত করেন। সেদিন বাবার দোয়া আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হয়েছিল ঠিকই, তবে আদালতের আইনজীবী হিসেবে নয়। সারা দেশের নেতা হয়েছিলেন তিনি। হয়েছিলেন সবার বন্ধু। আর তাই মানুষ ভালোবেসে তাঁর নাম দিয়েছে 'বঙ্গবন্ধু'। বাংলাদেশকে স্বাধীনতা উপহার দিয়েছেন বলে তিনি আমাদের 'জাতির পিতা'। মা-বাবার খোকার ভালো নাম শেখ মুজিবুর রহমান-সাথে পেয়ে গেল আরো কত নাম, দেখেছ?

কেন নয়? জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে ছোটোবেলা থেকেই ছিলেন দানশীল, মানুষের উপকারী বন্ধু, অন্যায়ের প্রতিবাদকারী। মানুষের দুঃখ তিনি সহ্য করতে পারতেন না। এক শীতের দিনে কী ঘটেছিল, বলি তোমাদের।

সন্ধ্যেবেলা। খোকা বাড়ি ফেরার সময় দেখে, তার বয়সী একটি ছেলে খালি গায়ে শীতে ঠক ঠক করে কাঁপছে। নিজের গায়ের শার্ট খুলে ছেলেটির গায়ে পড়িয়ে দিল খোকা। নিজের গায়ের চাদরটা শাড়ির মতো করে পেঁচিয়ে পরনের লুঙ্গিটা খুলে সেটাও দিল ছেলেটাকে। বাড়ি ফেরার পর বাবা তো ছেলের এ অবস্থা দেখে অবাক। সব কথা শুনে খুশি বাবা-মা।

সবাই বুঝতে পেরেছিলেন, যে ছেলে নিজের কথা চিন্তা না করে মানুষের ভালো চায়, সে নিশ্চয়ই একদিন বড়ো কিছু হবে। সবার এই ধারণা সঠিক হয়েছিল কী না, তোমরাই বলো? খোকা সারাটা জীবন বাংলার মানুষের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন বলে পাকিস্তানি শাসকদের অপছন্দের কারণ হয়েছিলেন। আর তাই জীবনের বেশিরভাগ সময় কারাগারে কাটাতে হয়েছে।

আবারো ফিরে যাই খোকার স্কুল জীবনে।

গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে পড়ছে খোকা। বাড়িতে একজন শিক্ষক রাখা হলো খোকার জন্য। তাঁর নাম কাজী আবদুল হামিদ। হামিদ স্যার 'মুসলিম সেবা সমিতি' গঠন করেছিলেন। গোপালগঞ্জের গরিব ছাত্রদের সাহায্য করা হতো এই সমিতি থেকে। বই-খাতা কিনে দেওয়া, স্কুলের বেতন-পরীক্ষার ফি দিতে সাহায্য করা ছিল সমিতির কাজ। ছাত্ররা বাড়ি

বাড়ি যেত থালা হাতে। সব বাড়ি থেকে মুঠো ভরে চাল তুলত সাহায্য হিসেবে। এই চাল বিক্রি করে যে টাকা আসত, তা দিয়ে গরিব ছেলেদের খরচ চালানো হতো। হামিদ স্যার বাড়ি বাড়ি ঘুরে গরীব মেধাবী ছাত্রদের জায়গীর ঠিক করে দিতেন। এর অর্থ হচ্ছে কোনো একটি বাড়ির ছেলে-মেয়েদেরকে শিক্ষক হিসেবে পড়াবে ছাত্রটি। বিনিময়ে ছাত্রটি সেই বাড়িতে থাকবে, খাবে অর্থাৎ জায়গীর থাকবে।

সমিতির বেশিরভাগ কাজই খোকা করে দিত। এ কাজে তার আনন্দ ছিল খুব। হামিদ স্যার যক্ষা রোগে আক্রান্ত হয়ে অকালে মৃত্যুবরণ করলেন। তখন খোকাই এই সমিতির ভার নিজের কাঁধে তুলে নেয়। অনেকদিন এই দায়িত্ব পালন করেছে খোকা।

শুধু কী দয়ার সাগর ছিলেন তিনি? খুব সাহস ছিল সেই ছোটোবেলা থেকেই। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেননি, দেশের মানুষকে বুক দিয়ে আগলে রেখে গেছেন। সবার বন্ধু বঙ্গবন্ধুর ছোটোবেলার তেমনি আরেকটি গল্প বলি তোমাদের।

মুজিব তখন ক্লাস এইটে পড়েন গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে। একদিন হৈ হৈ রৈ রৈ পড়ে গেল স্কুলে। সবাই বলছে, অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক আসবেন স্কুল পরিদর্শনে। তাঁর সাথে আসবেন বিখ্যাত রাজনীতিবিদ, সে সময়ের শ্রমমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।

ছাত্রদের মাঝে বেশ উত্তেজনা, শিক্ষকরাও ব্যস্ত হয়ে গেলেন। পুরো স্কুল ঝকঝকে তকতকে করার নির্দেশ দিলেন প্রধান শিক্ষক। বললেন, ঐ দিন পরিষ্কার কাপড় পরে স্কুলে আসতে হবে।

প্রত্যেক ক্লাসে শিক্ষকরা বলে দিচ্ছেন, কীভাবে কথা বলতে হবে। কোনো প্রশ্ন করলে কীভাবে উত্তর দিতে হবে, শিখিয়ে দিচ্ছেন ছাত্রদের। কম কথা নয়, বাংলার বাঘ বলা হয় যাঁকে, সেই শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক আসছেন! বিরাট ব্যাপার তো অবশ্যই। কোনো ভুল করা চলবে না।

সবার মতো ব্যস্ত মুজিবও। স্কুল পরিষ্কার করছেন, স্কুল সাজাচ্ছেন, তোরণ বানাচ্ছেন। এত সব কাজ করতে রাত হয়ে গেল। পরদিনই আসবেন অতিথিরা, তাই ব্যস্ততা ছিল বেশি। বাধ্য হয়ে থেকে গেলেন স্কুলের বোর্ডিং-এ।

রাতের বেলা। মুজিব দেখলেন বোর্ডিং-এর ছাদে ফুটো। ছাত্ররা বলল, এই ফুটো দিয়ে বর্ষাকালে বৃষ্টির পানি পড়ে, শীতকালে ঢোকে কুয়াশা। তখন তিনি মনে মনে ভাবতে লাগলেন, আমাদের এই সমস্যার কথা কী প্রধান শিক্ষক বলবেন প্রধানমন্ত্রীকে? সবাইকে ডেকে বললেন, প্রধান শিক্ষক যদি সমস্যার কথা না বলেন তো আমরাই বলব। তোরা সব থাকিস্ আমার সাথে।

সবাই একমত হলো।

পরদিন। প্রধানমন্ত্রী ও শ্রমমন্ত্রী এলেন স্কুল পরিদর্শনে। প্রধান শিক্ষকের রুমে কিছুক্ষণ বসলেন। প্রতিটি ক্লাস রুমে উঁকি দিয়ে দেখলেন। সবকিছু ঠিক আছে। কোথাও যেন কোনো সমস্যা নেই।

অতিথিরা স্কুল থেকে বেরিয়েছেন। এমন সময় মুজিব দ্রুত পায়ে হাঁটতে শুরু করলেন অতিথিদের দিকে। প্রধান শিক্ষক তো চিন্তায় পড়ে গেলেন। এ ছেলেকে থামাবেন কীভাবে, বুঝে পাচ্ছেন না। মুজিব তখন প্রধানমন্ত্রীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। বিশাল দেহের অধিকারী শেরে বাংলার সামনে দাঁড়িয়েছে ছোট্ট একটি ছেলে, ভয়ডর নেই! ছেলেটির মুখে অপরিসীম সাহসের ছাপ। বুদ্ধিদীপ্ত এক জোড়া চোখ জ্বলজ্বল করছে। প্রধানমন্ত্রীকে বললেন বোর্ডিং-এর ছাদ ফুটো, সেই কথা।

প্রধানমন্ত্রী জানতে চাইলেন, কত টাকা লাগবে ছাদ ঠিক করতে?

মুজিব উত্তর দিলেন, হাজার বারোশ টাকা লাগতে পারে।

প্রধানমন্ত্রী সাথে সাথে ঘোষণা দিলেন, তিনি তাঁর নিজস্ব তহবিল থেকে টাকা দিচ্ছেন। তাঁর সাথে থাকা কর্মকর্তাকে হুকুম দিলেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বোর্ডিং-এর ছাদ মেরামত করে দিতে।

শেরে বাংলা আর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী স্কুল থেকে বেরিয়ে ডাক বাংলোয় গেলেন দুপুরের খাবার খেতে। শেখ মুজিব নামের ছেলেটির সাহসের কথা আলাপ করছিলেন দু'জন। লোক পাঠিয়ে স্কুল থেকে ডেকে আনা হলো ছেলেটিকে। শেখ মুজিবকে কী বলেছিলেন সেদিন শেরে বাংলা, জানো তোমরা? তিনি বলেছিলেন, দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য শেখ মুজিবের মতো সাহসী ছেলেই দরকার।

সেই থেকে এই দুই নেতার সাথে সখ্যতা শুরু হলো মুজিবের। দিন গেল। এই দুই নেতার সাহচর্যে থেকে মুজিব হয়ে উঠলেন অনেক বড়ো নেতা। হয়ে উঠলেন বঙ্গবন্ধু। হয়ে উঠলেন জাতির পিতা।

স্বপ্নের পাখি

রহীম শাহ

যার কথা লেখা আছে ইতিহাসে
আছে বাঙালির প্রতি নিশ্বাসে
কীভাবে যে তাঁকে ভুলি
তাঁর জন্যই হাতে নিয়ে আছি
স্বপ্নের রংতুলি।

যার কথা আছে ফুলে ও ফসলে
নদী ও সাগর যার কথা বলে
তাঁকে প্রতিদিন আঁকি
তিনি মুজিবুর তিনি আমাদের
স্বপ্নের প্রিয় পাখি।

বঙ্গবন্ধুর ছোঁয়া

আলম তালুকদার

একটি আকাশ তোমায় দিলাম
কেনো?
একটি গোলাপ তোমায় দিলাম
কেনো?
একটি আশা তোমায় দিলাম
কেনো?
একটি স্বপ্ন তোমায় দিলাম
কেনো?
একটি দেশ তোমায় দিলাম
কেনো?
একটি বন্ধু তোমার জন্য
কেনো?
মহান নেতা তোমার জন্য
কেনো?
মহান পিতা তোমার জন্য
কেনো?
জবাব তুমি খুঁজতে থাকো, বুঝতে থাকো আরো
বঙ্গবন্ধুর গুণের ছোঁয়া পেলেও পেতে পারো।

সাব্বাস বাঙালি

দেলোয়ার হোসেন

বঙ্গে আছে বঙ্গবন্ধু
বঙ্গ নদীর দেশ,
হিজল গাছের শীতল ছায়া
সুখের তো নেই শেষ।

বঙ্গে আছে স্মৃতিসৌধ
জাতির বিজয় গাথা
মুক্তিযুদ্ধের গল্প ভরা
ইতিহাসের পাতা।

বঙ্গে আছে শহিদমিনার
ভাষার আন্দোলন,
ভাষার জন্য জীবন দিল
ছাত্র জনগণ।

বঙ্গে আছে লালন ফকির
নজরুল ও আব্বাস,
সারা বিশ্বের মানুষ বলে
বাঙালি সাব্বাস।

বঙ্গবন্ধু

আলমগীর কবির

কেউ বঙ্গের বন্ধু বলো,
সেই মানুষটার জন্ম হলো
দেশকে ভালোবাসবে বলে;

বুকটা জুড়ে চন্দ্র তারা
ভালোবাসার আলোক ধারা,
সবার সুখে হাসবে বলে।

মা ও মাটির বন্ধু বলো,
সেই মানুষটার জন্ম হলো,

স্বাধীনতার গান শুনিয়ে
স্বপ্ন আশার তান শুনিয়ে,
সব অনাচার নাশবে বলে।

তাঁরই ডাকে শ্রমিক -কৃষাণ,
আনলো জয়ের মুকুট - নিশান,

সবার বুকের ভাষায় ছিল
হয়ত এ দেশ আশায় ছিল
সেই মানুষটা আসবে বলে।

বঙ্গবন্ধু

চয়ন বিকাশ ভদ্র

মধুমতি নদীর তীরে
টুঙ্গিপাড়া গ্রাম ।
সেই গ্রামেরই একটি ছেলে
শেখ মুজিবুর নাম ।
হৃদয় জুড়ে দেশপ্রেম তাঁর
মস্ত বুকের ছাতি ,
তাঁরই ডাকে ধাপে ধাপে
প্রস্তুতি নেয় জাতি ।
এই ছেলেটিই বাজিয়েছিল
স্বাধীনতার বাঁশি ,
তিনি আমাদের জাতির পিতা
তাঁকে ভালোবাসি ।
বঙ্গবন্ধুর সব ঘাতকের
হয়ে গেলে ফাঁসি ,
গ্লানিমুক্ত জাতির মুখে
উঠবে ফুটে হাসি ।

মুজিব মানে

আনিসুর রহমান খান

মুজিব মানে সূর্য ওঠা ভোরের কোমল রোদ
মুজিব মানে স্বপ্ন চোখে চেতন হওয়ার বোধ
মুজিব মানে উড়াল পাখি ডানার পালক ফুল
মুজিব মানে ফুল্ল হাসি মায়ের কানের দুল।
মুজিব মানে লক্ষ প্রাণে কৃষ্ণচূড়ার ঘ্রাণ
মুজিব মানে হাজার নদী তৃষ্ণা মেটায় প্রাণ
মুজিব মানে চন্দ্র -তারা ফুটফুটে আসমান
মুজিব মানে লালন হাছন স্বাধীনচেতা গান।
মুজিব মানে হিরে -চুনি ঝলমলে এক মাঠ
মুজিব মানে জাতির চোখে প্রথম চেনা পাঠ
মুজিব মানে একটি কথা স্বপ্নে বোনা দেশ
মুজিব মানে লক্ষ পাতায় হয় না লেখা শেষ।

শোক স্মৃতির ঘর

নাহিদ সুলতানা (মিনা)

জন্মে আমি আঁকড়ে ধরি, স্বাধীন দেশের মাটি
বাবার মুখে প্রথম শুনি বঙ্গবন্ধুর কীর্তি।
বড়ো হয়ে পড়ে জানি গল্প-কবিতায়
শ্রেষ্ঠ বাঙালি তাঁকে মানে আজ বিশ্বের সবাই।
হঠাৎ আমার বায়না হলো দেখব পিতার ঘর
এখন না কী সেটা তাঁহার স্মৃতির জাদুঘর।
এসেই দেখি পুষ্পে ভরা তাঁর প্রতিকৃতি
শ্রদ্ধা জানাই বিনম্রতায় মনের অভিব্যক্তি।
পঁচাত্তরের পনেরো আগস্ট, নির্মম কালরাতে
ইতিহাসের হত্যাযজ্ঞ চালায় এ বাড়িতে।
ঝাঁঝরা করে বুকের পাজর হিংস্রদানবেরা
পিতার রক্তে লাল করিল বাংলার শ্যামল মায়া।
এক এক করে পরিবারের মারল সবাইকে
বাঁচতে তারা দেয়নি তবু, শিশু রাসেলকে।
আগস্ট এলেই শ্রাবণ কাঁদে আকাশ বুকে লয়ে
মুজিব তুমি ঘুমাও সুখে বাংলা মায়ের কোলে।
তোমার সোনার বাংলা আমরা সোনায় মোড়াবো
এ আগস্টে তোমার কাছে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

শেখ রাসেলের জন্য শোকগাথা

মঈনুল হক চৌধুরী

শেখ রাসেল। মিষ্টি মুখের সেই ছোট্ট রাসেল। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল। শুধু মুজিব পুত্র হবার কারণে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট মাত্র এগারো বছর বয়সে শিশু রাসেলকে প্রাণ দিতে হয় ঘাতকের বুলেটের মুখে। শিশু রাসেলের তাই বেড়ে ওঠা আর হয় না। এগারোতেই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে তার বয়স। অপার সম্ভাবনাময় এই শিশুটির পরিপূর্ণতায় বিকশিত হয়ে ওঠার সুযোগ দেয়নি ঘৃণ্য ঘাতকেরা। শিশু বলে রেহাই দেওয়া হয়নি তাকে। কী নৃশংস ভাবে রাসেলকে হত্যা করা হয়েছিল তা প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনায় জানা যায়।

১৫ আগস্টের এই শিশু হত্যা অবশ্যই রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড।

১৫ আগস্টকে ঘিরে রচিত হয়েছে ছড়া-কবিতা-গান-গল্প-প্রবন্ধ-নিবন্ধ-অসংখ্য রচনা। একইভাবে বঙ্গবন্ধুর শিশুপুত্র শেখ রাসেলও দেশের ছড়াকার ও কবি সাহিত্যিকদের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায়। মানবিকতার এই লাঞ্ছনা ও অবিচার ছড়াকার ও কবি হৃদয়কে ক্ষুব্ধ করেছে বলেই তাদের সৃষ্টিকর্মে শেখ রাসেল হয়ে ওঠে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধের প্রতীক। আর তাই তো রাসেলকে নিয়ে লেখা হলো ছড়াকার ও কবিদের ছন্দবদ্ধ শোকগাথা।

রাসেলেরা জাগবেই
সুকুমার বড়ুয়া

অতি লোভী নরপশু বন্দুকবাজরা
রাসেলের কচি বুক করে দিল ঝাঁঝরা।
দিন যায় দিন আসে ইতিহাস ডাকবেই
একজন কোটি হয়ে রাসেলেরা জাগবেই।

বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ সন্তান ছিল শেখ রাসেল। সবার আদরের ধন। সবাই তার আবদার পূরণ করার চেষ্টা করত। ছোট্ট রাসেলের মায়া মায়া চেহারা। ডাগর দুটি চোখ। দুচোখ জুড়েই হরেক স্বপ্নেরা খেলা করত সারাদিন। ফুল-পাখি-গাছপালা তার ছিল ভীষণ প্রিয়। হয়ত মনের অজান্তেই চুপি চুপি তাদের সাথে কথা বলত শিশু রাসেল। পাখিরা তাকে কী গান শোনাতো? জানতে বড়ো ইচ্ছে করে আজ।

ধিক
ফজল-এ-খোদা

দোয়েল যখন
লুটিয়ে পড়ে হঠাৎ কোনো ঝড়ে
তখন আমার
রাসেলকেই মনে পড়ে।

শাপলা কলি
যখন কেহ হঠাৎ ছিন্ন করে
তখন আমার
রাসেলকেই মনে পড়ে।

রাসেল এখন বিশ্ব শিশুর প্রতীক!
সব শিশুরই ঘাতকদের
ঘৃণা এবং ধিক।

রাসেল ১৯৬৪ সালের ১৮ অক্টোবর ঢাকার চিরচেনা ৩২নং সড়কের বঙ্গবন্ধুর ঘরে জন্মগ্রহণ করে। ফলে নতুন শিশুটির আগমনে বাড়িতে খুশির হাওয়া ছড়িয়ে

যায়। বড়ো চার ভাইবোনের পর রাসেলের জন্ম সবাইকে আনন্দে ভরিয়ে তোলে। শেখ রেহানার পর রাসেলের জন্ম একটা উৎসব হয়ে ওঠে। কে তাকে কোলে নেবে, কে তাকে আদর করে চোখে কাজল পরাবে, কে পাউডার মাখাবে- এসবের মধ্যদিয়েই একটু একটু করে রাসেল বড়ো হতে থাকে।

রক্তগোলাপ রাসেল

বেবী মওদুদ

রাসেল রাসেল কোথায় রাসেল
মায়ের কাছে আয়-
রক্তেভেজা রক্তগোলাপ
মায়ের আঁচলছায়।

রাসেল রাসেল কোথায় রাসেল
বাবার কাছে আয়-
রক্তেভেজা শরীর দেখে
রাসেল কাঁদে হায়।

রাসেল রাসেল কোথায় রাসেল
রাসেল রক্তে ভাসে
কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে গেছে
মায়ের কোলের পাশে।

বহুবার শেখ মুজিব কারাবরণ করতে বাধ্য হয়েছেন। শিশু রাসেল মায়ের কোলে চড়ে কারাগারে যেত পিতাকে দেখতে। পিতার আদর, স্নেহ ও ভালোবাসা এভাবেই তাকে পরিপুষ্ট করে তোলে। বাড়িতে ভাইবোনদের হাতে সে ছিল পুতুল। তারা তাকে সেভাবেই আদর করত, সাজাতো, ছবি তুলত, খাওয়াতো আর তার সাথে খেলা করত। শিশু রাসেল ছিল সবার চোখের মণি এবং রূপকথার রাজপুত্তুর।

রাজপুত্র-রাজার কুমার

পীযুষ বন্দ্যোপাধ্যায়

রূপকথা নয় সত্যকথা, জেনো
এক রাজকুমারের গল্প বলি
মন লাগিয়ে শোনো।
রাজপুত্র রাজার কুমার মিষ্টি চাঁদের কণা
সর্বাঙ্গে আঁকা ছিল বাংলার আলপনা।
মায়ের আদর বাবার স্নেহ বোনভাইয়ের কোলে
রাজপুত্র স্বপ্নমাখা ভুবনখানি দোলে
পাড়াপড়শি ইষ্টিকুটুম সবার চোখের আলো
হাসিতে তার মায়া ঝরে সবাই বাসে ভালো।

মা ছিল তার একমাত্র আশ্রয়। তার কাছেই যত আবদার, তার সাথেই যত অভিমান। মায়ের আঁচলের ছায়ায় রাসেল ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যেন পিতাকেও স্বপ্নে দেখত। রাসেল নামটি বাবার দেওয়া। বাবার প্রিয় ব্যক্তিত্ব বিখ্যাত লেখক-দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল। বাবা জানতেন তার এই ছোট্ট ছেলেটিও একদিন আপন প্রতিভায় দীপ্ত হয়ে উঠবে। না, রাজনীতি নয়- সে হোক অন্য কিছু। লেখক, দার্শনিক কিংবা বড়ো বিজ্ঞানী অথবা বিশ্বশান্তির নতুন কাণ্ডারি। বাবার জানাটা কী মিথ্যে ছিল? কী করে মিথ্যে হয়? এই বাবাই তো বলেছিলেন এদেশকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাআল্লাহ। তিনি সব জানতেন। জানতেন একদিন এদেশ মুক্ত হবে। স্বাধীন জাতি হিসেবে বাঙালি বিশ্ব দরবারে মহিমান্বিত হয়ে উঠবে। তাই তো হয়েছে। তাহলে তাঁর ছোট্ট ছেলেটি রাসেলের বেলায় তাঁর ভবিষ্যৎ বাণী মিথ্যে হবে কেন? বাবা যেখানে গিয়েছেন সাথে নিয়েছেন রাসেলকেও। জাপান, ভারত, যুগোস্লাভিয়া- রাসেল ঘুরেছে বাবার সাথে। রাসেল বাইরের পৃথিবী আগেই জেনে নিক, এটাই ছিল বাবার প্রত্যাশা।

পায়রা ডাকে না

ফারুক নওয়াজ

টুঙ্গিপাড়ার পাখি আজও কাঁদে
দোয়েল ভুলেছে গান,
হঠাৎ কেমন হয়ে যায় যেন
ঘাস ফড়িঙের প্রাণ।

মধুমতি পাড়ে আছড়ে পড়েছে
ছোটো ছোটো ঢেউগুলো,
শোকের কষ্ট জানাতে উড়ছে
এখনো পথের ধুলো।

ধানমন্ডির পায়রা ডাকে না
গায় না যে বুলবুল,
ফোটে না চামেলি, শুধু ফোটে থাকে
রক্তকরবী ফুল-

কারণ তাদের ছোট্ট বন্ধু
রাসেল নেই যে, তাই-
বুকের কষ্ট হাহাকার হয়ে
বাতাসে ছড়িয়ে যায়।

রাসেল সে সময় পড়ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরি স্কুলের চতুর্থ শ্রেণিতে। মাঝে মাঝে রাসেল কল্পনার তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে দুরন্ত পঙ্খীরাজের পিঠে চেপে উড়ে যেত স্বপ্নপুরির কোনো দেশে। তার নিষ্পাপ হাসি, মিষ্টি কথা যে-কারো হৃদয়

কেড়ে নিত এক নিমিষে। শিশুরা যে স্বর্গের দূত, তার প্রমাণ মিলত রাসেলের মিষ্টি হাসিমাখা মুখটি দেখে।

রাসেল রাসেল ডাক পাড়ি

লুৎফর রহমান রিটন

রাসেল রাসেল ডাক পাড়ি
রাসেল গেল কার বাড়ি?
আয় ফিরে আয় রাসেল তুই
ডাকছে তোকে শাপলা জুঁই।
কান্নাভেজা পাখির সুর
গেছিস কী তুই অনেক দূর?

হাসু আপার চোখের জল
ফুরায় না ক্যান? রাসেল বল?
জনমদুখী বোনটি তোর
আনল দেশে নতুন ভোর
নতুন ভোরে নতুন দিন
শোধ হবে তোর রক্তঋণ?

হাসু আপা ডাকছে তোকে
থাকিসনে আর অচিনলোকে।
আয়রে রাসেল ফিরে আয়
ভালোবাসার আঙিনায়।

রাসেল অনেক বড়ো হবে, তাকে দেখে এমনটিই ভেবেছিলেন সবাই। কিন্তু নিয়তির পরিহাস। ১৯৭৫-এর মধ্য আগস্টের সেই কালরাত। শিশু রাসেল মায়ের কোল ঘেষে ঘুমিয়ে ছিল। মানুষ নামের কতিপয় মুখোশধারী নিষ্ঠুর ঘাতক তার স্বপ্ন ভেঙে চুরমার করে দিল। মা-বাবার সাথে সপরিবারে শহিদ হলো শিশু রাসেল। রাসেল বড়ো হলে কী হতো আমরা তা জানি না। ঘাতকের দল আমাদের তা জানতে দেয়নি। তাই রাসেল আমাদের কাছে একটি নিষ্পাপ শিশুই রয়ে গেছে এবং থাকবে চিরদিন। আমরা তাকে ভুলব না, ভুলব না কোনোদিন।

ছোট্ট শিশু রাসেল

মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ্ কায়সার

আমাকে তোমরা কেন বাধা দাও
গুলির শব্দ কেনো
শেখ মুজিবের ছোটো ছেলে আমি
আমাকে তোমরা চেনো?

বাবাকে ডাকব কোথায় বাবা যে
তাঁর কাছে নিয়ে চলো
এত রাতে কেন বাড়িতে তোমরা
বলো না বলো না বলো।

দেখছি না মাকে ভাই ও ভাবীরা
কোথায় গিয়েছে আজ
আমি যে রাসেল পড়েছি বিপাকে
মাথায় পড়েছে বাজ।

গুমট কেমন বাড়িটা হয়েছে
কেনো যে গভীর রাতে
বাড়ির সবাই বন্দি কী আজ
ডাকাত দলের হাতে?

সাহসী রাসেল চিৎকার করে
তোমরা কোথায় মা গো
ডাকাতের দল আমাকে ধরেছে
ছুটতে পারছি না গো।

ঘাতকের দল বুলেট ছুঁড়েছে
রাসেল সোনার বুকে
কীভাবে পারলো খুঁচিয়ে মারতে
ছোট্ট এই শিশুকে!

হাসু আপার ভাইবোন

মধুর সম্পর্কে কষ্টের স্মৃতি

শাহানা আফরোজ

মা-বাবা- ভাই বোন নিয়ে আমাদের পরিবার। আমরা সবাই পরিবারের সাথে মিলে মিশে থাকি। সেখানে আছে সুখ-দুঃখ, কষ্ট-ভালোবাসা। যখন আমরা পরিবার থেকে দূরে থাকি তখন এসব স্মৃতি আমাদের হাসায়, কাঁদায়, কখনো বা জীবনে সামনে এগিয়ে চলার আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করে। যখন এ পরিবার হারিয়ে যায় তখন আমরা কী আমাদের মাঝে থাকি! স্মৃতিও ঝাপসা হয়ে যায় চোখের জলে।

পিতা মাতার আশীর্বাদের হাত যখন আলো-ছায়া হয়, ভাই-বোনের স্নেহ ভালোবাসার খুনসুঁটি শুধু অ্যালবামেরই পাতায় থাকে, তখন নিজের জীবনের চাওয়া পাওয়া থাকে না। ধূসর হয় চারপাশ। ছোট্ট এ পৃথিবীতে অনেক মানুষ আছে যাদের মা-বাবা নেই কিংবা ভাই-বোন নেই। কিন্তু একসাথে একই বাড়িতে যদি সবার মৃত্যু সংবাদ পাওয়া যায়, সেই শোক বয়ে বেড়ানোর মতো ক্ষমতা মানুষের আছে কিনা আমার জানা নেই। বিশ্ব মাঝে এমন ইতিহাস খুঁজের পাওয়া না গেলেও সোনার বাংলায় আছে সেই রকম একজন মানুষ যিনি একরাতেই হারিয়েছেন পরিবারের সবাইকে। তিনি হলেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আপনজন হারানো বিপুল দুখের বোঝা মাথায় নিয়ে চলছেন আজও। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হারিয়েছেন পরিবারের সবাইকে, সাথে ছিল আরো আত্মীয়স্বজন। তবু তিনি হেরে যাননি। আঁকড়ে ধরে আছেন স্মৃতির পাহাড় দেশের মানুষকে ভালোবেসে। ভুলেননি ক্ষণিকের জন্য। মাঝে মাঝে ঝাঁপি খুলে বসেন আর চোখ মোছেন। প্রধানমন্ত্রীর সে ব্যথাতুর স্মৃতির কিছু ছবি আর স্মৃতিকথা নিয়ে তোমাদের জন্য আজকের আয়োজন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর স্মৃতিচারণে বলেছেন: 'আমার জীবনেও আমি দেখেছি যে, গুলির সামনে আমি এগিয়ে গেলেও কোনোদিন আমার স্ত্রী বাধা দেয় নাই। এমনও দেখেছি যে, অনেকবার আমার জীবনের ১০/১১ বছর আমি জেল খেটেছি। জীবনে কোনোদিন মুখ কালা কিংবা আমার উপর প্রতিবাদ করে নাই। তাহলে বোধহয় জীবনে অনেক বাধা আমার আসত। অনেক সময় আমি দেখেছি যে, আমি যখন জেলে চলে গেছি আমি একআনা পয়সাও দিয়ে যেতে পারি নাই আমার ছেলেমেয়ের কাছে। আমার সংগ্রামে তাঁর দান যথেষ্ট রয়েছে'।

...'একদিন বঙ্গবন্ধু আর রেণু টুঙ্গিপাড়ার বাড়িতে খাটে বসে গল্প করছিলেন। নিচে বসে খেলছিল হাসিনা আর কামাল। হাসিনা খেলা ছেড়ে মাঝে মাঝে দৌড়ে এসে বাবার কোলে ওঠে। গলা জড়িয়ে ধরে আব্বা, আব্বা বলে ডাকে। বাবা মেয়েকে আদর করে কপালে চুমু দেন। ছোটো ভাইটি মেঝেতে বসে দেখে। ওর ভীষণ লোভ হয় এইভাবে আদর পেতে। শুধু তাকিয়ে থাকা ছাড়া ওর আর কিছু করার বয়স হয়নি।

একটু পরে হাসিনা খেলার জায়গায় ফিরে গেলে কামাল বলে, হাচু আপা, হাচু আপা তোমার আব্বাকে আমি একটু আব্বা ডাকি। রেণু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, বিনা বিচারে বন্দি থাকতে হলে ছেলে তো বাবাকে ভুলবেই। বাবার আদার-সোহাগ কী জিনিস ছেলেটি বুঝতেই পারলো না।

বঙ্গবন্ধু ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে বলেছিলেন, আমি তো তোমারও আব্বা মানিক। ডাকো, তুমি আমাকে আব্বা ডাকো। কতবার ডাকতে পারো দেখি।

হাসিনা ঘরজুড়ে লাফাতে লাফাতে বলেছিল, আব্বার আদর পাওয়া যে কত মজার এতদিনে তা আমার ছোট্ট ভাইয়া বুঝতে পেরেছে। তারপর সুর করে বলেছিল, আদর নাও ময়না পাখি, আদর নাও। আদর নাও ফিঙে পাখি, আদর নাও। সব আদর মাথায় নিয়ে শ্বশুরবাড়ি যাও। শ্বশুরবাড়ি যাও।

মেয়ের কাণ্ড দেখে খুব হেসেছিলেন দুজনে। দুজনেই ভেবেছিলেন, ভাইয়ের অভিমান ঝরিয়ে দিয়েছিল বোনটি। ভাইবোনের সম্পর্কই এমন মধুর।

রাসেল চলা ফেরায় ছিল বেশ সাবধানী কিন্তু সাহসী সহসা কোনো কিছুতে ভয় পেত না। কালো কালো বড়ো পিঁপড়া পেলে ধরতে যেত। একদিন একটা বড়ো ওলা (বড়ো কালো পিঁপড়া) ধরে ফেলল আর সাথে সাথে কামড় খেল। ছোট্ট আঙুল কেটে রক্ত বের হলো। সাথে সাথে ওষুধ দেওয়া হলো। আঙুলটা ফুলে গেছে। তারপর থেকে আর পিঁপড়া ধরতে যেত না। কিন্তু ঐ পিঁপড়ার একটি নাম নিজেই দিয়েছিল। কামড় খাওয়ার পর থেকেই বড়ো কালো পিঁপড়া দেখলেই বলতো ভুট্টো।

ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরামের বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগ দিতে সুইজারল্যান্ড গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। সম্মেলন শেষে ফিরতি পথে খানিকটা সময় তিনি পেলেন, তখন কোনো কাজ ছিল না।সঙ্গে বোন শেখ রেহানা। বরফে আচ্ছাদিত চারপাশ। এমন পরিস্থিতিতে শিশুদের বরফ নিয়ে খেলার কথা তাঁর মনে পড়ে গেল। নিচু হয়ে বরফ তুলে নিলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি তো আর সবার উদ্দেশ্যে তা ছুঁড়তে পারেন না। তাই বরফ খেলায় বেছে নিলেন ছোটো বোন শেখ রেহানাকেই। এই বরফ পড়লো তার মাথাতেই। তবে শিশুরা যেভাবে বরফ ছুঁড়ে মারে, সেটা করার বয়স এখন নেই শেখ হাসিনার। শেখ রেহানার মাথার ওপর হাত তুলে তা ছাড়েন তিনি। বোনের এই বরফ খেলায় দারুণ আনন্দ পেয়েছেন শেখ রেহানা। তিনিও হাস্যোজ্জ্বল চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন।

তথ্যসূত্র:

শেখ ফজিলাতুন নেসা মুজিব; ইতিহাসের সাহসী মানুষ/সেলিনা হোসেন এবং ইন্টারনেট

কান্না

মোজাম্মেল হক নিয়োগী

আবিদ হাসানের তিন ছেলে। তিন মেয়ে। মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে। ছেলেরা একসঙ্গেই থাকে। তিন ছেলের তিন জন করে শিশু। যৌথ পরিবার। বাসাটিও বেশ বড়ো। এই বাসার শিশুদের মধ্যে মান্না, পান্না, আন্না, তিন্নি, উর্মি, হান্নান ছোটো। তাদের বয়স তিন থেকে পাঁচ। একদিন হলো কী, পান্না কান্না শুরু করে। কান্না আর থামে না। পান্নার বয়স তিন বছর হবে। দুই মাস বেশি হতে পারে। পান্না কাঁদতে কাঁদতে বারান্দায় চলে যায়। সে বারান্দার গ্রিল ধরে কাঁদতে থাকে। পান্নার কান্নার শব্দ শুনে পাশের রুম থেকে বের হয়ে আসে মান্না। মান্নাও কান্না শুরু করে। মান্না কাঁদছে বারান্দায় যাওয়ার দরজার পাশে বসে। মান্নার বয়স কত হবে? মান্নার বয়স চার বছর। ভয়ানক কান্না। মান্নার কান্না শুনে অন্য রুম থেকে বের হয়ে আসে আন্না। আন্নাও কাঁদতে শুরু করে। সে ড্রয়িং রুমের সোফায় মুখ লুকিয়ে কাঁদতে থাকে। আন্না ছোটো চাচার মেয়ে। তিন বছর বয়স। বাড়িতে কান্নার রোল পড়ে। সবার কান্নার শব্দ শুনে দৌড়ে আসে তিন্নি। তিন্নিও কান্না শুরু করে। মহা মুশকিলের ব্যাপার। তারপর উর্মি। আর হান্নান। তারাও কাঁদতে থাকে। ভয়ানক ঘটনা।

বড়োরা বাসায় কেউ নেই। দাদা-দাদি গেছেন বারডেম হাসপাতালে রক্তের সুগার পরীক্ষা করতে। অন্যরা চাকরি করেন, গেছেন অফিসে। এদের মধ্যে একটু বড়ো শুধু হান্নান। তার বয়স পাঁচ বছর। তার স্কুলে যাওয়ার কথা ছিল। যায়নি। তার নাকি পেটে ব্যথা।

একজনের কান্নার শব্দ শুনে অন্যজনের কান্নার ভলিউম বেড়ে যায়। পাশের বাসা থেকে কেউ কেউ উঁকি দিয়ে দেখছে। ব্যাপার কী? কিন্তু কোনো রহস্য উদঘাটন করতে পারছে না। কেউ কেউ বলছে, ওরা খেলছে। পাশের বাসার মানুষদের মাথাব্যথা এখানেই থেমে যায়। নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত হয়। এর বেশি আর কী হতে পারে? শহরের বাড়ি বলে কথা। কেউ খুন হলেও কেউ দেখে না। চোখ বুজে পড়ে থাকে।

তিন্নি একটু চালাক। তার নাকি অনেক বুদ্ধি। বাসায় অনেক খ্যাতি। বলা যায়, নয় জনের মধ্যে সেই জ্ঞানে, গুণে খ্যাতি অর্জন করেছে। মিডিয়াতে যাওয়ার চান্স আছে। মা-বাবার এমনই আশা।

তিন্নি মোবাইল ফোন নিয়ে মাকে ফোন করে। হ্যালো মা!

কী হয়েছে মা? বলো।

মা, আমরা সবাই এখন কাঁদছি। অ্যাঁ। অ্যাঁ।

মা খুব চিন্তিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কেন? তোমরা

সবাই মিলে কাঁদছ কেন?

তিন্নি কান্নার জন্য আর কথা বলতে পারেনি। সে ফোন কেটে দেয়। আর একজন একজন করে বাবা-মা, চাচা-চাচি সবাইকে ফোনে একই বার্তা দেয়। সবাইকে সে বলল, আমরা সবাই মিলে কাঁদছি। তোমরা তাড়াতাড়ি এসো।

সবাই অফিস থেকে ছুটি নিয়ে বাড়ির দিকে ছোটে। বড়ো বৌমা রাগে কটমট করছে। দুজন বুড়ো মানুষকে বাসায় রেখে গেলাম তারা কোথায় গেল? ছোটো বৌমাও চেঁচালো। মেঝো বৌমা শ্বশুর-শাশুড়িকে ফোন করে বলল, তাড়াতাড়ি বাসায় আসেন।

সবাই ছোটাছুটি করে বাসায় ফিরে আসে। তখন সকাল দশটা। বাসায় এসে দেখে সবাই কাঁদছে। কী ভয়ানক কান্না! থামানো কঠিন। আবিদ সাহেবের বড়ো ছেলে জিজ্ঞেস করলেন, হান্নান তুমি কাঁদছ কেন?

হান্নান বলল, তিন্নি কাঁদছে তাই আমিও কাঁদছি।

তিন্নির মা জিজ্ঞেস করল, তিন্নি তুমি কাঁদছ কেন?

তিন্নি বলল, আন্না কাঁদছে। আন্নার কান্না দেখে আমার কান্না পেলে আমি কী করব? আমি কী কাঁদব না?

মা বললেন, হ্যাঁ, তা তো ঠিকই। ওদের কান্না দেখে তোমারও কান্না উচিত।

বড়ো চাচা আন্নাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কাঁদছ কেন?

আন্না বলল, আমি তো মান্নার কান্না দেখে কাঁদছি। ও কাঁদছে আর আমি হাসব? আমি কি কাঁদব না?

হ্যাঁ। তোমার তো কাঁদতেই হবে। নিশ্চয়ই কাঁদা উচিত।

মান্নাকে ছোটো চাচি জিজ্ঞেস করল, তুমি তাহলে কাঁদছ কেন?

মান্না বলল, পান্না কাঁদছে দেখে আমিও কাঁদছি। আমি ওর কান্না দেখে কী হাসব? কাঁদব না?

ছোটো চাচা বললেন, না, তা কী করে হয়? হাসবে কেন? কান্না করাই উচিত।

শেষ পর্যন্ত মেঝো চাচা পান্নাকে জিজ্ঞেস করল, তাহলে তুমি কাঁদছ কেন? তোমার কী হয়েছে?

পান্না কাঁদতে কাঁদতে বলল, কালকে রাতে পেন্সিল আর রাবারটা টেবিলে রেখেছিলাম। সকালে দেখি, অ্যাঁ অ্যাঁ। রাবারটা মেঝেতে পড়ে আছে। অ্যাঁ। অ্যাঁ।

সবাই ধপাস ধপাস করে সোফায় বসে। তারপর টিস্যু পেপার দিয়ে কপালের চিকন ঘাম মোছে।

আমার বন্ধুরা

সঞ্জয় দেবনাথ

আকাশ ডাকে, ডাকে পাখি কোমল সুরে
ডাকে আমায় প্রজাপতি অদ্ভুতুড়ে
ভাবছ তুমি পাগল আমি নষ্ট মাথা
তাই তোমাদের অবাক করে বলছি যা তা।
আকাশ, পাখি, প্রজাপতির আহ্বানে
মনের মাঝে স্বপ্ন বুনি সঙ্গোপনে
কিন্তু জানো এই আমি তো দৃষ্টিহারা
কল্পনাতেই সৃষ্টি করি রঙিন ধরা।
বন্ধু আমার আকাশ, নদী, পাখপাখালি
কল্পনাতে সবার সাথে হয় মিতালি
ফুলের ঘ্রাণে পাখির গানে কী জাগরণ
এসব দিয়ে মনের কষ্ট ভুলি তখন।

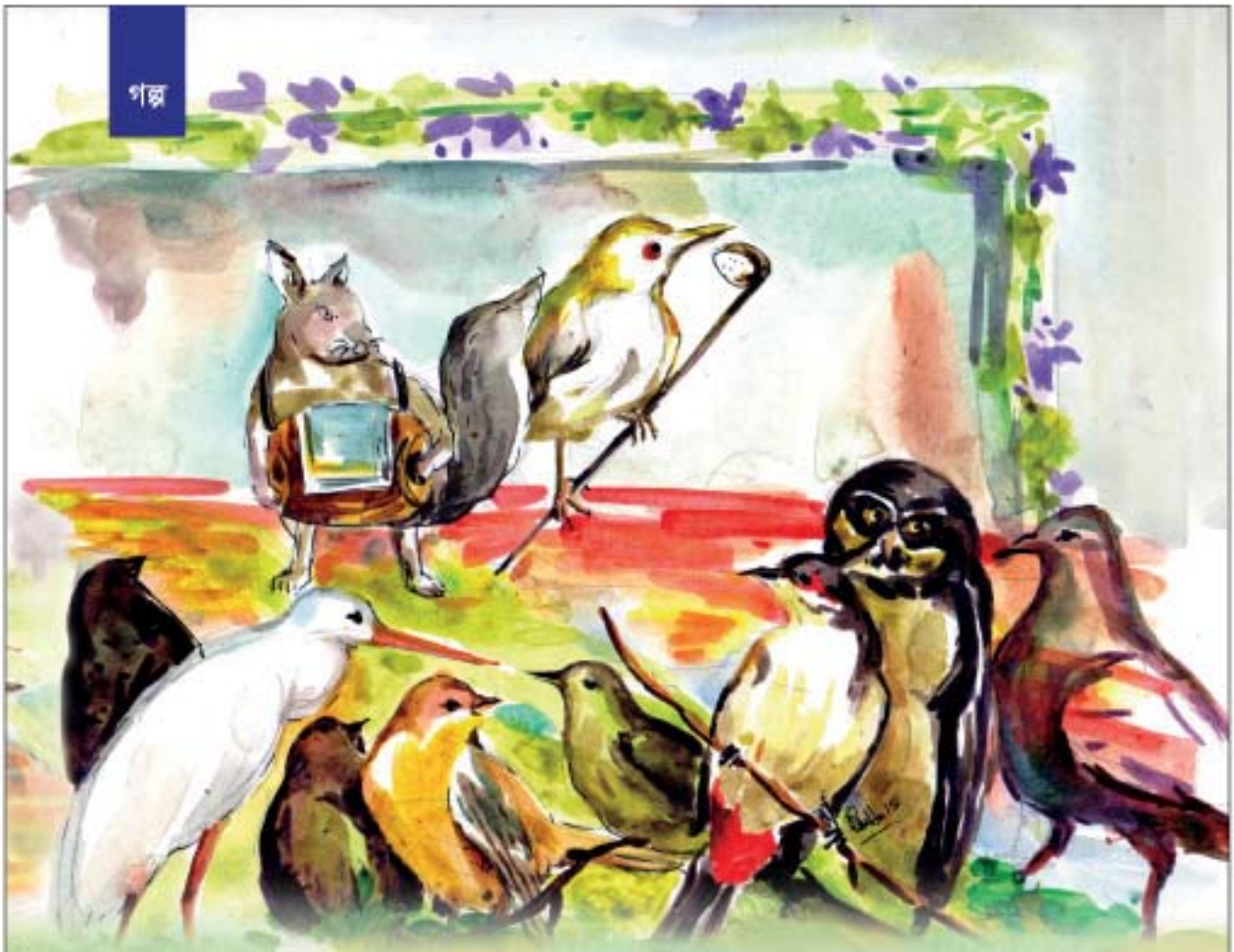

মিলেমিশে থাকি

নিশাত সুলতানা

শালবনের সবচেয়ে উঁচু গাছে পাখিদের পাড়া। কে নেই সেখানে? শালিক, দোয়েল, ময়না, টিয়া, শ্যামা সবাই ঘরসংসার পেতে বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে বেশ সুখেশান্তিতেই আছে। কেবল ভালো নেই মগডাল থেকে ঠিক দুটি ডাল নিচে পাশাপাশি বাস করা দুটি পরিবার। পরিবার দুটির একটি শালিকের আর অন্যটি ময়নার । তাদের মধ্যে বড্ড রেষারেষি। কেউ কাউকে দেখতে পারে না। সব সময় চেষ্টা করে কীভাবে একজন অন্যজনকে হেনস্থা করবে।

একদিন ময়না গিন্নি সকালে বাচ্চাদের খাইয়েদাইয়ে বারান্দায় রোদ পোহাচ্ছিল। হঠাৎ সে লক্ষ্য করল শালিক গিন্নি ঠোঁটে এক গুবরেপোকা নিয়ে উড়ে চলেছে তার নিজের বাসার দিকে। হঠাৎ কীভাবে যেন গুবরেপোকাটি তার ঠোঁট থেকে ছুটে উড়ে এসে বসল ময়না গিন্নির গালে। আর যায় কোথায়! অমনি ময়না গিন্নি শুরু করল চিৎকার চেঁচামেচি। তার যে গুবরে পোকায় বড্ড ঘেন্না! সে ভাবল শালিক গিন্নি ইচ্ছে করেই বুঝি গুবরেপোকাটি ছুঁড়ে দিয়েছে তার দিকে। সে এক দৌড়ে ছুটে গেল তার কর্তার কাছে। নালিশ জানালো শালিক গিন্নির নামে। তারা দুজন মিলে ঠিক করল কীভাবে এর প্রতিশোধ নেওয়া যায়।

অন্য দিকে ময়না গিন্নি জানত যে শালিক গিন্নির কেঁচোতে খুব ভয়। তারা দুজন মিলে শলা-পরামর্শ করে পরদিন ভোরে কিছু কেঁচো রেখে এল শালিকদের দরজার সামনে। সকালে যেই না শালিক গিন্নি দরজা খুলল অমনি একগাদা কেঁচো দেখে ভয়ে হুলুস্থুল শুরু করে দিল সে। সেও তার কর্তাকে ডেকে এর

প্রতিকারের দাবি জানালো। শুরু হলো ময়না পরিবারকে হেনস্থা করার নতুন প্রস্তুতি।

শালিক আর ময়না পরিবারের প্রায় রোজ এহেন কাণ্ড কারখানায় অস্থির পাড়ার সকল পাখিরা। তাদের চিৎকার চেঁচামেচিতে রোজ সকালের গানের রেওয়াজ নষ্ট হতো তাদের। তারা সভায় বসল কীভাবে এর প্রতিকার করা যায়। তারা তৈরি করল এক পরিকল্পনা।

দু-দিন বাদে খুব ভোরে ধোঁয়ার গন্ধে ঘুম ভাঙল শালিক আর ময়না পরিবারের সবার। প্রথমেই যে-যার রান্নাঘরে ছুটে গেল । দেখল সবই ঠিকঠাক আছে। ময়না গিন্নি সাথে সাথে বেরিয়ে এল বাইরে, পিছনে তার কর্তা। শালিক গিন্নিও এক দৌড়ে বাইরে এল। সাথে তার ছানা-পোনারা। হঠাৎ-ই চোখে পড়ল দুই বাড়ির মাঝের বেড়ায় আগুন। আগুন দেখে ময়না গিন্নি ও শালিক গিন্নি দু'জনই দু'দিক থেকে ছুটে আসতে গেল দ্রুতগতিতে। বুঝল আর ঝগড়া করার সময় নেই। এবার একসাথে নেভাতে হবে আগুন। দু'দিক থেকে দু'জন দ্রুত আসতে গিয়ে হঠাৎ সজোরে ধাক্কা খেল তারা। অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল দু'জনেই। অন্য দিকে চারদিক থেকে ছুটে আসলো পাড়ার অন্যান্য পাখিরা। তারা তো আগে থেকেই পানি আর বালি নিয়ে আগুন নেভানোর জন্য প্রস্তুত ছিল। এ তো ছিল তাদেরই পরিকল্পনার অংশ। তারা দ্রুত নিভিয়ে ফেলল আগুন। কিন্তু ময়না গিন্নি ও শালিক গিন্নির ধাক্কা খেয়ে অজ্ঞান হয়ে যাবার বিষয়টি ছিল তাদের ধারণার বাইরে। সবাই মিলে দ্রুত তাদের দু'জনকে পাখি পাড়ার হাসপাতালে ভর্তি করল।

এক ঘন্টা বাদে জ্ঞান ফিরল তাদের দু'জনেরই। দেখল তারা শুয়ে আছে পাশাপাশি দুটি বিছানায়। একরাশ বিরক্তি নিয়ে যেই না ময়না গিন্নি উঠতে গেল অমনি হুড়মুড়িয়ে পড়ে যেতে লাগল। কেন জানি তাকে বাঁচাতে নিজের ব্যথা বেদনা ভুলে তার দিকে পাখা বাড়ালো শালিক গিন্নি। ময়না গিন্নি সে পাখার সাথে তার পাখা মেলালো। কোনোরকমে রক্ষা পেল সে। হঠাৎ-ই তারা দুজন দু'জনের জন্য খুব মায়া অনুভব করল। বুঝল, তারা এতদিন যা করেছে তা ভুল করেছে। পাশাপাশি বাস করে ঝগড়াঝাঁটি করে কোনো লাভ নেই। বরং একসাথে মিলে চলাতেই আনন্দ। সেই থেকে তারা আর কখনো গণ্ডগোল করেনি। তাদের দুই বাসার মাঝের সীমানার বেড়া তো আগেই পুড়ে গিয়েছিল। তারা আর সেই বেড়া নতুন করে তৈরি করল না। শালিক আর ময়না পরিবারের কর্তা, গিন্নি, ছানাপোনারা সেই থেকে মিলেমিশে এক হয়ে চলতে লাগল। শান্তি পেল পাখি পাড়ার অন্যান্য পাখিরাও।

সেলমা লেগারলফ

কথাশিল্পে বিশ্বজয়

মোমিন মেহেদী

স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে চলা স্বপ্ন নতুন কথা বলা
এসব নিয়েই হাসি

সেলমা যেমন লিখে গেছেন জীবন থেকে শিখে গেছেন লেখা ভালোবাসি...

সাহিত্যে প্রথম নারী নোবেল জয়ী সেলমা লেগারলফের সংগ্রামী জীবন নিয়ে এমন অনেক কিছুই লেখা যায়। তাঁর শ্রেষ্ঠ শিশুসাহিত্য 'নিলস হোলগার সন্স আন্ডারবারা রেসা জেনম সভারিজ' বা 'দ্য ওয়ান্ডারফুল অ্যাডভেঞ্চার্স অব নিলস'-এর জন্য বিশ্ব জোড়া খ্যাতি পেয়েছেন তিনি। সুইডিশ এ লেখক প্রচণ্ড একাগ্রতা আর মনোশক্তি দিয়ে জয় করেছেন শারীরিক পঙ্গুত্ব। সংগ্রামী জীবনকথা তিনি নিজের মতো করে সাজিয়ে লিখেছেন। তার অধিকাংশ বই ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- *ইনভিজিবল লিঙ্কস, দ্য মিরাকলস অব অ্যান্টিক্রাইস্ট, জেরুজালেম, দ্য ট্রেজার, দাই সোল সেল বেয়ার উইটনেস, দ্য ফ্যান্টম ক্যারিজ, গোস্তা বার্লিংস সাগা, ওসলিঙ্গা ল্যাঙ্কার, ডকটিটারস্পেল, দ্য আউটকাস্ট, মারবাকা : দ্য স্টোরি অব এ মেনর, মেমরি অব মাই চাইল্ডহুড : ফার্দার ইয়ার্স অ্যাট মারবাকা* এবং *হার্ভেস্ট*। প্রতিটি বইতে তিনি নিজের জীবন থেকে পাওয়া স্বপ্নময় জীবনের কথা তুলে এনেছেন। তিনি যে শারীরিকভাবে অসম্পূর্ণ ছিলেন, তা কখনোই তার লেখায় আসেনি; আসেনি জীবনের কোনো আক্ষেপও।

সেলমা লেগারলফ ১৮৫৮ সালের ২০ নভেম্বর মারবাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা এরিক গুস্তাফ লেগারলফ সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (লেফটেন্যান্ট) ছিলেন। মায়ের নাম লুইস লেগারলফ নি ওয়ালরথ। এই দম্পতির ছয় সন্তানের পঞ্চম হলেন সেলমা। মাত্র তিন বছর বয়সে সেলমা পক্ষাঘাতের কারণে পঙ্গু হয়ে যান। তিনি কোমরে আঘাত নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন। কম বয়সে অসুস্থতায় তার দুই পা খোঁড়া হয়ে যায়। এ সময়ে তার দাদা তাকে প্রচুর ভূতপ্রেত আর রহস্যগল্প শোনাতেন। ছোটোবেলা থেকে তিনি ছিলেন বয়সের তুলনায় ভারিক্কি ও শান্ত স্বভাবের। তবে তার বাবা চাননি সেলমা পড়াশোনায় মনোযোগ দিক। কিংবা তিনি এটাও চাননি- সেলমা নারী আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করুক। ১৮৮৪ সালে বাবার অসুস্থতার কারণে মারবাকা এস্টেট বিক্রি করতে বাধ্য হন, যা তার জীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলে।

শিক্ষাজীবনে সেলমা ছিলেন অনন্য প্রতিভার অধিকারী। তার প্রতিভা দেখে সেই সময়ের সেরা লেখক আনা ফ্রিসেল তাকে পড়াশোনা করানোর দায়িত্ব নেন। প্রিপারেটরি স্কুল শেষ করার এক বছর পর তিনি স্টকহোম টিচার্স ট্রেনিং কলেজে ভর্তি হন এবং তিন বছর পর ১৮৮৫ সালে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। স্কুলে থাকাকালীন তিনি হেনরি স্পেনসার, থিওডোর পার্কার ও চার্লস ডারউইনের মতো উনিশ শতকের গুরুত্বপূর্ণ লেখকদের লেখা পড়ে শেষ করেন।

পড়ালেখার পাশাপাশি সেলমা ছিলেন নিবেদিত তার লেখনীতেও। ছোটোবেলা থেকেই তিনি পড়াশোনার পাশাপাশি প্রচুর কবিতা লিখতেন। ১৮৮৫-৯৫ সাল পর্যন্ত ল্যান্ডস্ক্রোনার একটি বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। এ সময় তিনি গল্প বলার কৌশলের ওপর জোর দেন। তিনি তার প্রথম উপন্যাস গোস্তা বার্লিংস সাগা এ সময়েই লিখতে শুরু করেছিলেন, যা পরে ১৮৯১ সালে প্রকাশিত হয়।

১৮৯৫ সালে লেখালেখিতে মনোযোগ দেওয়ার উদ্দেশে শিক্ষকতা ছেড়ে দেন সেলমা। এসময় তিনি তার প্রথম উপন্যাস 'গস্তা বেরলিংস সাগা' লেখা শুরু করেন। এর প্রথম অধ্যায় একটি সাহিত্য প্রতিযোগিতায় জমা দিয়ে বইটি প্রকাশের পুরস্কার জিতে নেয়। লেখালেখির জন্য বিখ্যাত সুইডিশ নারীবাদী ফ্রেদরিকা লিমনেলের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্যও পেয়েছেন। তিনি তখনকার দিনের গুরুত্বপূর্ণ অনেক ইউরোপিয়ান লেখকের সান্নিধ্য পান। ১৯০০ সাল থেকে সেলমা ইতালি, ফিলিস্তিনসহ প্রাচ্যের অনেক জায়গায় ঘোরাঘুরি করেন। এসব অভিজ্ঞতা তার লেখনীতে ফুটে উঠেছে। ১৯০৯ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান তিনি ।

'মেমরি অব মাই চাইল্ডহুড : ফার্দার ইয়ার্স অ্যাট মারবাকা' বই থেকে জানা যায়, মারকাবার বাড়ি ফিরে পাওয়ার মতো অনন্য কাজটি তিনি সম্ভব করেছিলেন। যে কাহিনির সূত্রতায় জানা যায়, ১৯০৭ সালে সেলমা জানতে পারেন কোনো এক দুঃসময়ে বিক্রি হওয়া তাদের মারকাবার বাড়ি আবার বিক্রি হচ্ছে। তিনি দেরি না করে সেই বাড়িটি কিনে নেন এবং যাবতীয় পরিচর্যা করে সেটিকে নতুন রূপ দেন। এমনকি তিনি ওই বাড়ির চারপাশের অনেক জমিও কিনে ফেলেন।

নির্বাক চলচ্চিত্রেও অভিনয় করেছেন সেলমা। তার লেখা উপন্যাসকে কেন্দ্র করে ১৯১৭ থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত নির্মিত হয়েছে কয়েকটি নির্বাক চলচ্চিত্র ও টিভি সিরিজ। ১৯২৭ সালে গোস্তা বার্লিং সাগা উপন্যাসটি চলচ্চিত্রায়িত হয়েছিল- যার প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন হলিউডের বিখ্যাত অভিনয়শিল্পী গ্রেটা গারবো।

সেলমা লেগারলফ ভালোবাসতেন শিশুদের। নিজের বেশির ভাগ লেখাতেই তুলে এনেছেন শিশু আর কিশোরদের কথা। জীবন বোধের কথায় তিনি লিখেছেন, 'যে তোমাকে ভালোবেসেছে, পৃথিবীর কোনো কিছু দিয়ে তার ঋণ তুমি শোধ করতে পারবে না।' 'কোনো ভ্রমণে গেলে তুমি এই ভেবে বিস্মিত হবে যে- তুমি বাড়ি ফিরে এসেছ।' শুধু এখানেই শেষ নয়; অনন্য জীবনের দিকে ক্রমশ এগিয়ে যেতে যেতে তিনি শিশুদের কথা মনে করে আরো লিখেছেন, 'তুমি কী কখনো কোনো শিশুকে তার মায়ের হাঁটুর ওপর বসে পরীর গল্প শুনতে দেখেছ? এক সময় শিশুটি যখন শোনে সুন্দরী রাজকন্যা হিংস্র দৈত্যের সামনে বিপদাপন্ন অবস্থায় রয়েছে- তখন শিশুটি চোখ বড়ো করে মাথা ওপরের দিকে উঁচিয়ে তাকিয়ে থাকে। যখন তার মা তাকে সূর্যালোক আর কোনো সুখের গল্প শোনায় তখন সে মায়ের কোলে ঘুমিয়ে পড়ে। ...আমিও তার মতোই শিশু।'

ছোটোদের ছড়া

বঙ্গবন্ধু

মেশকাউল জান্নাত বীথি

আগস্ট মাসে মনে পড়ে
বাঙালির প্রিয় একটি নাম
তিনি হলেন বাঙালির শ্রেষ্ঠ সন্তান
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

স্বাধীনতার ডাক দিলেন
দেশকে স্বাধীন করার জন্য
এমন নেতা পেয়ে মোদের
জীবন হলো ধন্য।

শোকের মাসে এই মহান নেতাকে
জানাই হাজার সালাম।
যার কারণে মোরা বাংলাদেশ পেলাম।

৭ম শ্রেণি, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, খিলগাঁও, ঢাকা।

প্রিয় নেতা

আরিফা আক্তার

বঙ্গবন্ধু আছে আমাদের মাঝে
হয়ে চির অম্লান
শোকের মাসে জানাই তাঁকে
হাজার সালাম।

দেশের জন্য জীবন দিতে
করেনি তো কোনো ভয়
তাঁর হাত ধরে এসেছে
আমাদের স্বাধীনতার বিজয়।

৭ম শ্রেণি, মতিঝিল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা।

মন দেয়ালের ছবি

লিয়ন আজাদ

বাংলার বুকে ঘুমিয়ে আছে
লাখো শহিদের প্রাণ,
জাগবে তাঁরা প্রভাত হলে
গাইবে জয়ের গান।
মন দেয়ালে এঁকেছি আমি
লাখো বীরের ছবি,
তাঁদের জন্য কাঁদে আকাশ
কাঁদে ভোরের রবি ।
তোমরা কেহ নয়তা মৃত
আছে তোমাদের প্রাণ,
কোটি লোকের হৃদয় জুড়ে
শুধু তোমাদের স্থান ।

দশম শ্রেণি, শিমুলিয়া স্কুল এন্ড কলেজ পাকুন্দিয়া, কিশোরগঞ্জ

দাও না ছুটি

সাইদুল ইসলাম

সকালবেলা আব্বু বলেন
খাতা-কলম নাও,
খানিক পর আম্মু বলেন
স্কুলেতে যাও।
বিকেলবেলাও পড়ালেখা
কত্তরকম পাঠ,
জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখি
ডাকছে খেলার মাঠ।
রাত্রিবেলা বাংলা, গণিত
ইংরেজি, বিজ্ঞান
চাঁদ-তারারা ডাকছে তখন
যাও গো শুনে গান।
রোজ এভাবে চলছে আমার
পাঠ্যবইয়ের পড়া,
আমায় একটু দাও না ছুটি
লিখব গল্প-ছড়া।

নবম শ্রেণি, কক্সবাজার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, সিনিয়র ক্যাম্প, কক্সবাজার

ব্ল্যাকবিক ব্যান্ড

রুকাইয়া রচনা

ঘুম ভাঙল খুব সকালে শুনে একটা গান
বিরক্ত হয়ে চিৎকার দিলাম প্লিজ গানটা থামান।
গায়িকা যেন উৎসাহ পেয়ে বেজ বাড়ালো আরো
সেই গানেতে বিছানায় থাকার সাধ্য নেই কারো।
বিরক্ত হয়ে বিছানার পাশে টেনে জানালার থাই
মাথার ওপর বালিশ চাপিয়ে তবুও রক্ষা নাই।
অবশেষে যখন ভেঙে গিয়েছে সহ্যের সীমানা
উঠে পড়ি আমি ছেড়ে দিয়ে সব বালিশ-বিছানা।
বীরদর্পে খুলে থাই গ্লাস দেখি জানালা দিয়ে
ব্ল্যাকবিক ব্যান্ড গান গাইছে আমার দিকে চেয়ে।
কালো শাড়ি পরা লিড সিঙ্গার আমায় ভেঙচি কাটে
তাই না দেখে রাগে আমার মাথাটা যায় ফেটে।
ইলেক্ট্রিক তারে বসে থাকা ঐ কাককে নিশান করে
হাতের কাছে যা পেয়েছি সব দিয়েছি ছুঁড়ে।
ইট পাটকেল ছুঁড়তে দেখে দুষ্টু বাদক দল
উড়াল দিল মেলে দিয়ে ঐ কালো আঁচলের তল
কাক নামের এই পাখির দলটি ব্ল্যাকবিক ব্যান্ড নামে
প্রতিদিনই ব্যাঘাত ঘটায় সাত সকালের ঘুমে।
টিকিটহীনা কনসার্ট চলে সূর্য ওঠার পরে
তাদের দিনটা চলে যায় বেশ-
আমার ঘুমটা কেড়ে।

নবম শ্রেণি, জয়পুরহাট গার্লস ক্যাডেট কলেজ।

পাট দিয়ে আসবাব!
তরুণ স্থপতিদের কৃতিত্ব

প্রসেনজিৎ কুমার দে

বন্ধুরা, পাট সম্পর্কে তোমরা তো জানো। পাটকে বাংলাদেশের সোনালি আঁশ বলা হয়। পাট প্রাকৃতিক ফসল। পাট আমাদের দেশের অন্যতম প্রধান অর্থকরী ফসলও বটে। আবার এই পাটের রচনাও লিখি পরীক্ষার উত্তর পত্রে। পাট আমাদের জাতীয় পণ্য। এক সময় মনে করা হতো পাট দিয়ে শুধু বস্তা, ছালা, রশি তৈরি করা যায়। কিন্তু সেই ধারণা এখন আর নেই। এখন পাট দিয়ে শত শত পাট পণ্য তৈরি হচ্ছে। এই যেমন- পাটের তৈরি পোশাক, জামদানি শাড়ি, ব্লেজার, পাঞ্জাবি, বিছানার চাদর, জানালা-দরজার পর্দা, ব্যাগ, সোফার কভার, জুতা-স্যান্ডেল ইত্যাদি। তাছাড়া এ বছর মার্চ মাসে দেশে প্রথম বারের মতো পাট দিবস পালন করা হয়েছে। আর এ দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজন করা হয়েছিল বহুমুখী পাট পণ্যের মেলা। মেলায় পাট পণ্যের তৈরি গৃহসজ্জার পাশাপাশি ছিল শো-পিস, টিস্যু বক্স, খেলনা, ফুল, ফুলদানি, ওয়ালমেট, ফটোফ্রেমসহ নানান পণ্য। ছিল আলোকসজ্জার বাতি, দোলনা, সিকা, ঝুলানো ফুলদানি, ফুলের টব, পাখির বাসা, পুতুলসহ শিশুদের বাহারি খেলনা সামগ্রী। মেলার সব পণ্যের মধ্যে পাটের তৈরি টেউটিন, পাটের পাতার চা, পাটের তৈরি পলিথিন ব্যাগ আর মুজিবকোট ছিল আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। আর এসবই কিন্তু ছিল সোনালি আঁশ পাট দিয়ে-ই তৈরি।

২০১০ সালের জুন মাসে পাটের জীবন রহস্য উন্মোচন হয়। আবিষ্কারক ছিলেন জিনতত্ত্ববিদ শ্রদ্ধেয় প্রয়াত ড.মাকসুদুল আলম। আর এরপর থেকেই পাট নিয়ে গবেষণার শেষ নেই। এখনো চলছে। তাছাড়া বিশ্বব্যাপী প্লাস্টিক জাতীয় পদার্থের ব্যবহার অতিরিক্ত বেড়ে যাচ্ছে। যা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। এজন্য পরিবেশবান্ধব পাটজাত পণ্যের ব্যবহার বেড়ে চলেছে।

তবে এবার বাংলাদেশের তরুণ শিল্পীরা পাট নিয়ে এক অন্য রকমের চমক দিল। হ্যাঁ,পাট দিয়ে এবার তৈরি হলো আধুনিক ডিজাইনের টেকসই আসবাব। ১০ জুলাই ফ্রান্স-জার্মান দূতাবাসে 'পাট ও সমন্বিত ঐতিহ্য এবং আবিষ্কার প্রকল্প' (জুট অ্যান্ড কম্পোজিট, ট্র্যাডিশন অ্যান্ড ইনোভেশন) শীর্ষক সাংস্কৃতিক প্রদর্শনীর আয়োজন হয়। আর এ প্রদর্শনীর মূল আকর্ষণ ছিল পাট। বাংলাদেশের ঐতিহ্য পাটকে তুলে ধরা হয় এক অভিনব কৌশলে। অর্থাৎ পাট দিয়ে তৈরি আধুনিক ডিজাইনের আসবাব। পাট নিয়ে যে এত সুন্দর আসবাব তৈরি হতে পারে তা না দেখলে বিশ্বাস হবে না। আর এটা সম্ভব হয়েছে আমাদেরই দেশের তরুণ শিল্পীদের হাতে।

প্রদর্শনীতে তুলে ধরা হয় একটি আর্মচেয়ার ও একটি সাইড টেবিল। যা দেখে মনে হবে বাংলার পাট যেন নতুন রূপে ফিরে আসছে। ফ্রান্স-জার্মান দূতাবাসের উদ্যোগে 'পাট ও সমন্বিত ঐতিহ্য এবং আবিষ্কার প্রকল্পের' আওতায় তৈরি করা হয়েছে এ আসবাবপত্র। পাট ও রেজিনের সঙ্গে আরো সব উপকরণ যোগ করে আসবাবপত্র তৈরি করাই ছিল এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। উল্লেখ্য, ২০১৬ সালের মাঝামাঝি অলিয়াঁস ফ্রঁসেজ দো ঢাকা, গেটে ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ, অটবি এবং গোল্ড অব বেঙ্গলের সঙ্গে মিলে 'পাট ও সমন্বিত ঐতিহ্য এবং আবিষ্কার' শীর্ষক একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলার শিক্ষার্থীরা এ বিষয়ে নকশা জমা দেয়। জমা দেওয়া নকশা থেকে ৮টি নকশা নির্বাচিত হয়। বিজয়ী নকশাকারীরা ছিলেন সবাই স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষার্থী। তারা হলেন বি.এম. তাহাম্মুল কবীর, আনিসুল ইসলাম খান, জাকির আহম্মেদ অপু, আনিন্দ, রেজওয়ানা রাকা সিদ্দিকা, ফারাহ জেরিন, রাকিবুজ জামান, ফাহিম হাসিন সহন। তারপর নির্বাচিত নকশাকারীরা সাতদিনের কর্মশালায় অংশ নেন। এতে প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন ফরাসি বিশেষজ্ঞ অটোয়া থ্রিপে। জুট ল্যাবের বিশেষজ্ঞ কয়েনটা মাতিয়াস এবং গোল্ড অফ বেঙ্গলের বিশেষজ্ঞ ক্লেম রোনোঁ। কর্মশালাটি অলিয়াঁস ফ্রঁসেজে অনুষ্ঠিত হয়। এখানে নির্বাচিত নকশাগুলোকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার কৌশল খুঁজে বের করা হয়। অংশগ্রহণকারী দুইভাগে ভাগ হয়ে দুটি প্রকল্পে কাজ করেন। তারা একটি আর্মচেয়ার এবং একটি সাইড টেবিল তৈরি করেন।

এ সময় প্রদর্শনীর প্রধান অতিথির বক্তব্যে সংস্কৃতি মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর বলেন, 'আমরা পাটের দামি জিনিস বানাবো এবং তৈরি পোশাকের মতো বিদেশে রপ্তানি করব। পাট দিয়ে আসবাবপত্র তৈরি হচ্ছে। এটি নতুন বাংলাদেশকে আবিষ্কার করেছে।' এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত সোফি অবের এবং জার্মানির রাষ্ট্রদূত ড. থমাস প্রিঞ্জ। জার্মানিতে পাটের প্রচুর চাহিদার কথা উল্লেখ করে জার্মানির রাষ্ট্রদূত বলেন, দামি গাড়ির আসনের জন্য এটি অচিরেই ব্যবহার করা হবে। কারণ এটি পরিবেশবান্ধব। অন্যদিকে ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত বলেন, 'এটি চমৎকার একটি প্রকল্প। আধুনিক কালের চাহিদা পূরণে পাটকে নতুন আদলে কাজে লাগানো সম্ভব। প্রদর্শনীতে অংশ নেওয়া তরুণ নকশাকারীদের হাতে সনদপত্র তুলে দেন দুই দেশের রাষ্ট্রদূত।

বই আলোচনা

সুজন বড়ুয়ার শ্রেষ্ঠ কিশোর কবিতা

নুরুল ইসলাম বাবুল

সুজন বড়ুয়া একজন খ্যাতিমান শিশুসাহিত্যিক। শিশু-কিশোরদের জন্যে রয়েছে তাঁর বুকভরা ভালোবাসা। তাই তিনি শিশুসাহিত্যের সব কটি শাখায় কাজ করেছেন, করে চলেছেন নিরলসভাবে। ছড়া-কবিতা, গল্প উপন্যাস, জীবনী, নাটক, প্রবন্ধ, গবেষণা, অনুবাদ সবকিছুই শিশুদের জন্যে। তাঁর লেখা পাঠে আমাদের ছোট্ট বন্ধুরা নতুন নতুন স্বপ্ন দেখে। তাদের ভাবনা আর কল্পনাগুলো প্রসারিত হয়। মন ও মননে, চিন্তা ও চেতনায় যোগ হয় এক ভিন্ন মাত্রা। সুজন বড়ুয়া তাই অনন্য-অসাধারণ শিল্পী। তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতি স্বরূপ পেয়েছেন বহু পুরস্কার, সম্মাননা। শিশুসাহিত্যে অবদানের জন্য ২০১৫ সালে পেয়েছেন 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার'। যা তাঁর প্রাপ্য ছিল।

আমাদের শিশুসাহিত্যের একটি অনন্য শাখা কিশোর কবিতা। কিশোর কবিতা দিয়ে সাজানো তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'বাড়ির সঙ্গে আড়ি' (১৯৮৫) প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি কেড়ে নেয় সুধী-পাঠক-সমাজের। তারপর পেছনে তাকানোর সময় হয়নি সুজন বড়ুয়ার। প্রতিনিয়ত লিখে চলেছেন স্বপ্নমাখা কিশোর কবিতা।

আমার হাতে আছে সুজন বড়ুয়ার 'শ্রেষ্ঠ কিশোর কবিতা' বইটি। প্রকাশক আদিগন্ত প্রকাশন। বইটিতে ৬২টি কিশোর কবিতা রয়েছে। পড়লেই বুঝবে, কবিতাগুলো কত্ত মজার!

কবিতা বাছাইয়ের ক্ষেত্রে অত্যন্ত যত্নশীল ছিলেন লেখক। আর সে কারণেই তাঁর ঝাঁপিভরা কবিতা থেকে উঠে এসেছে ৬২টি শ্রেষ্ঠ কবিতা। বিষয় বৈচিত্র্যে ভরপুর, হৃদয় নিংড়ানো আবেগ আর ভালোবাসা মাখা প্রত্যেকটি কবিতা। মুক্তিযুদ্ধের কবিতা, প্রকৃতি প্রেমের কবিতা, দেশপ্রেমের কবিতা, ঋতু বিষয়ক কবিতা, মাকে নিয়ে কবিতা; সেই সাথে নদী, গাছপালা, বইমেলা, মেঘ, খেলাসহ ভিন্ন ভিন্ন বিষয় উঠে এসেছে নানা ভাবে নানা কবিতায়।

সুজন বড়ুয়ার কিশোর কবিতায় কিশোর মনের আবেগ, ইচ্ছে, ভালোবাসা, স্বপ্ন আর কষ্টগুলো উঠে এসেছে বারবার। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় বড়োদের সাথে সাথে যুদ্ধে অংশ নিয়েছে অসংখ্য কিশোর। তেমনি এক কিশোরের যুদ্ধে যাবার জন্য মায়ের কাছে বিদায় নেওয়ার আকুতি উঠে এসেছে ' মাগো আমি যুদ্ধে যাবো' কবিতায়। সুজন বড়ুয়া লিখেছেন–

আমার দেবার কী আছে মা ! যুদ্ধে দেবো প্রাণ,
আর দেবো সব বোনের গলায় তোমার জয়ের গান,
গানের সুরে ঘুমিয়ে যেয়ো, গড়িয়ে যাবে রাত,
বোনরা তোমার ঘুম ভাঙাবে বুলিয়ে নরম হাত।

হাজার নদীর মাতা তুমি, নদীর কাছে যাও
আমি একার যুদ্ধে যাবো, মাগো বিদায় দাও।

আবার অন্য এক কিশোর মাকে শুনাচ্ছে পক্ষিরাজে চড়ে উড়ে যাবার স্বপ্ন। সত্যি সে যদি পেয়ে যায় কোনো পক্ষিরাজ, তাহলে সে কোথায় কোথায় ভেসে যাবে তারই চিত্রকল্প প্রকাশ পেয়েছে 'পেতাম যদি পক্ষিরাজ' কবিতায়।

'পক্ষিরাজে চড়েই যেতাম উড়ে
সেই সেখানে দূরে অনেক দূরে,
.....
তারপরে মা হলো আসল কাজ,
ছিনিয়ে নিই দস্যিরাজার তাজ,
.....
আসতো না বান এই গ্রামে মাঠ পারে,
পুড়তো না ধান খরায় বারে বারে,

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র হাত থেকে পরিবেশ পদক-২০১৭ গ্রহণ করছেন মোকারম হোসেন

নবারুণ
লেখকের সাফল্য

নবারুণ-এর খুদে পাঠকদের খুব ভালো লাগে প্রকৃতি। ভালো লাগে প্রকৃতি নিয়ে মোকারম হোসেনের লেখা। শুনে খুশি হবে, জাতীয় পরিবেশ পদক পেয়েছেন প্রিয় লেখক মোকারম হোসেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত থেকে পদক গ্রহণ করেছেন তিনি। গাছ-পাখি-প্রকৃতি-পরিবেশ ভালোবাসলে মন ভালো থাকে। জীবন হয় সুন্দর। মোকারম হোসেন এমন কথা বারবার লিখেছেন তোমাদের জন্য। আশা করি তোমরাও তাঁর মতো হবে।

মরতো না কেউ কোথাও অনাহারে,
থাকতো না মা কোনোই ঝক্কি আজ,
ঝড়ের দিনে শরের বেগে ছোটে
পেতাম যদি এমন পক্ষিরাজ।'

স্বপ্ন আর কল্পনায় বিভোর কিশোর ভাসে আবার চোখের জলে। সুজন বড়ুয়ার তেমনি একটি বুক হাহাকার করা কবিতা 'লালীর জন্য'। লালী একটা ছোট্ট বাছুর। আগেই তার মাকে বিক্রি করা হয়েছে। কিশোরের সাথে নিঃসঙ্গ লালীর খুব ভাব। একে অপরের বন্ধু। কিন্তু কিশোর বালকের বাবা-মা অভাবী মানুষ। সংসার চলে না। খানিকটা অভাব ঘুচাতে তাই একদিন লালীকে হাটে নিয়ে যান বাবা। স্কুল থেকে ফিরে কিশোর খুঁজে পায় না লালীকে। মায়ের কাছে জানতে পারে লালীকে বিক্রি করার কথা। ঠিক তখনই শুনি কিশোর বালকের বুকফাটা আর্তনাদ–

'লালী যদি নেই আমি কেন থাকি আর,
লালী কেন নেই? লালী কেন চলে গেছে?
তোমাদের যদি এত টাকা দরকার,
লালীর সঙ্গে আমাকেও দাও বেচে।'
(লালীর জন্যে)

একটা কিশোরের ভেতর খেলা করে হাজারটা কিশোর মন। কত রকম তার বায়না। কত রকম তার স্বপ্ন। কতই না ইচ্ছে তার অন্তর জুড়ে। কিশোর নিজেই বলছে সে কথা 'আমার আমিগুলো' কবিতায়। সুজন বড়ুয়ার উচ্চারণ–

'একটা আমি শান্ত-সবোধ
একটা আমি দুষ্ট
গোল পাকানোর বিদ্যায় সে
ভীষণ পরিপুষ্ট,
একটা আমি ভক্ত মায়ের
একটা আমি বাবার
এই যে দুটোই হঠাৎ যেন
নয় কারো নয় আবার,
আমার ভেতর লুকিয়ে আছে এমনি অনেক আমি
আমায় নিয়ে চলে তাদের হাজারো দুষ্টামি।'

এভাবেই প্রতিটি কবিতায় সুজন বড়ুয়া কিশোর মনের দোলাচল ভাবনা, স্বপ্ন-সাধনা তুলে ধরেছেন আবেদনময়ী ভাষায়। ছন্দের অন্তমিল আর শব্দের কারুময় ব্যবহার মুগ্ধ করে বারবার। শুধু একবার নয়, অনেকবার পড়ার মতো বই। শুধু শিশু-কিশোর নয়, সকলের মন জয় করার মতো বই। সুজন বড়ুয়ার 'শ্রেষ্ঠ কিশোর কবিতা' এ ধারার শ্রেষ্ঠ বই-ই বটে।

রবি-রশ্মি

আহসানুল হক

কেউ পারবে না করতে কারু
করতে কুপোকাত ?
'রবি'র দিকে যদি সবাই
দেয় বাড়িয়ে হাত !

দুঃখ-বেদনা আসলে কভু
হঠাৎ অকস্মাৎ
রবি- রশ্মি পথ দেখাবে
কাটবে আঁধার রাত !

তাঁর উপন্যাস-কাব্য-গানে
ভাঙে আলোর বাঁধ
জীবনটা হয় খুব বিবর্ণ
থাকলে 'রবি' বাদ !

'রবির' ছটায় মুগ্ধ সবাই
জাগে আহ্লাদ
তিনিই প্রথম এনে দিলেন
নোবেল জয়ের স্বাদ !

দুখু নামের সেই ছেলেটি

শচীন্দ্র নাথ গাইন

একটি ছেলের দস্যিপনা চলত সারাক্ষণ,
তবুও সে জুগিয়ে যেত গরিব-দুখীর মন।
লেটোর দলে নাচ দেখিয়ে গাইত নিজের গান,
শত কাজের মাঝেও ছিল মায়ে অগাধ টান।

শৈশবে সে হঠাৎ করেই হারালো তার বাপ,
তখন থেকেই বইতে হতো পরিবারের চাপ।
শক্তি-সাহস অটুট থাকায় কাঁপেনি তার বুক,
ন্যায়ের পথে লড়াই করে খুঁজত তাতে সুখ।

নির্যাতিত-বঞ্চিতদের জানত স্বজন-ভাই ,
ভালোবেসে তাদেরকে তাই অন্তরে দেয় ঠাঁই।
অনাহারির কষ্ট-জ্বালার কি ভয়ানক রূপ!
অভিজ্ঞতা ছিল বলেই থাকেনি সে চুপ।

কুলি-মজুর-শ্রমিক কিষাণ করত তারই দল,
সঙ্গে তারা থাকার কারণ বাড়ত মনোবল।
তার লেখন পড়ে এবং দেখে অবাক কাজ,
ধনী-বণিক-শোষক শ্রেণির পড়ত মাথায় বাজ।

সেই ছেলেটির কাব্য-গানে জাগিয়ে তোলার কথা,
মনে গেঁথে যুদ্ধে গিয়ে পেলাম স্বাধীনতা।
অত্যাচারী শোষকগুলো সেদিন হলো ভীত
আমরা উড়াই বিজয় নিশান,শত্রু পরাজিত।

নজরুল পড়লেই

গোলাম নবী পান্না

ঘুমে ঢুলু ঢুলু শেষে
জেগে জেগে হাই তোলো
মনে পড়ে যাবে ছড়া–
'ভোর হলো দোর খোলো'।

ছোটোবেলা দুষ্টুমি–
গাছে চড়া ফল ধরা
মনে সেই পড়বেই–
'লিচু চোর' এই ছড়া।

'রণ সংগীত' গেয়ে
গানে গানে পথ চলা
পায়ে পায়ে তাল রেখে–
'চল্ চল্ চল্' বলা।

'বিদ্রোহী' কবিতাটি
আবৃত্তি করলেই
মনে পড়ে যাবে, কবি–
'নজরুল' পড়লেই।

বিষ্টির গান

জাকির হাসান

টুপ টুপাটুপ টুপ টুপাটুপ
টুপ টুপাটুপ টুপ
ঝরছে কেবল দিন ও রাতে
নেই থামা নেই চুপ
লতা-পাতা-শাখা-ডালে
টাপুর টুপুর টিনের চালে
হাট-ঘাট-মাঠ-বন-বাদারে
ছন্দে তালে মেঘ আঁধারে
নেই থামা নেই চুপ
টুপ টুপাটুপ টুপ
বৃষ্টি ভিজে কদম কেয়া
বাঁধা নৌকা বন্ধ খেয়া
পাখ-পাখালি বসা নীড়ে
বৃষ্টি পড়ে প্রবল ,ধীরে
টুপ টুপাটুপ টুপ টুপাটুপ
টুপ টুপাটুপ টুপ
নেই থামা নেই চুপ।

শাপলা শালুক

মনসুর জোয়ারদার

খাল-বিল-পুকুরে
রাত ভোর দুপুরে
ফোটে ফুল শাপলা শালুক
এই দেশে ছড়িয়ে
এই মাটি জড়িয়ে
হলো প্রিয় শাপলা শালুক।
ডুবে গলা পানিতে
মাথা রেখে উঁচুতে
ভেসে থাকে শাপলা শালুক
গোলপাতা সাজিয়ে
দোল খায় শাপলা শালুক।
সাধ হলে দুপুরে
দলবেঁধে সাঁতরে
তুলে আনি শাপলা শালুক
হাতে নিয়ে ফুলটি
দেখে তার রূপটি
ভালো লাগে শাপলা শালুক।

বাবুই পাখির ভয়

নাহার আহমেদ

বাবুই পাখি আঁতকে উঠে
হঠাৎ সেদিন ভোরে
আম গাছটা পড়ছে হেলে
ঝড় উঠেছে জোরে।
এই তুফানে ঘরটা বুঝি
এবার ভেঙে যাবে।
মাথা গোঁজার ঠাঁইটা এখন
কোথায় খুঁজে পাবে।
আপন হাতে নিপুণ ভাবে
একটু একটু করে
ভালোবাসার ঘরখানা সে
নিয়েছিল গড়ে।

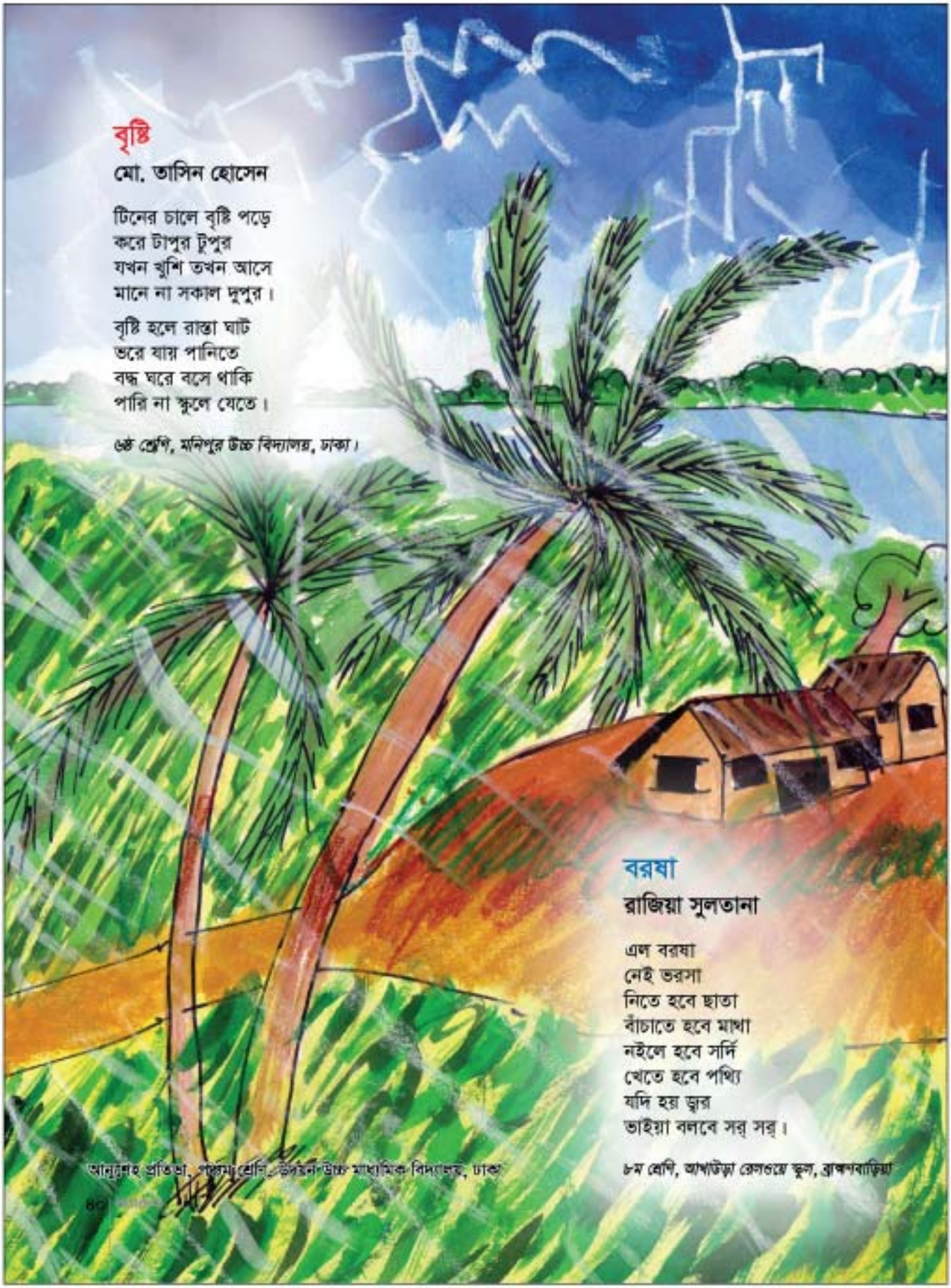

বৃষ্টি

মো. তাসিন হোসেন

টিনের চালে বৃষ্টি পড়ে
করে টাপুর টুপুর
যখন খুশি তখন আসে
মানে না সকাল দুপুর।

বৃষ্টি হলে রাস্তা ঘাট
ভরে যায় পানিতে
বদ্ধ ঘরে বসে থাকি
পারি না স্কুলে যেতে।

৬ষ্ঠ শ্রেণি, মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা।

বরষা

রাজিয়া সুলতানা

এল বরষা
নেই ভরসা
নিতে হবে ছাতা
বাঁচাতে হবে মাথা
নইলে হবে সর্দি
খেতে হবে পথ্যি
যদি হয় জ্বর
ভাইয়া বলবে সর্ সর্।

৮ম শ্রেণি, আখাউড়া রেলওয়ে স্কুল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

আনুশেহ প্রতিভা, পঞ্চম শ্রেণি, ভিকারুননিসা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা

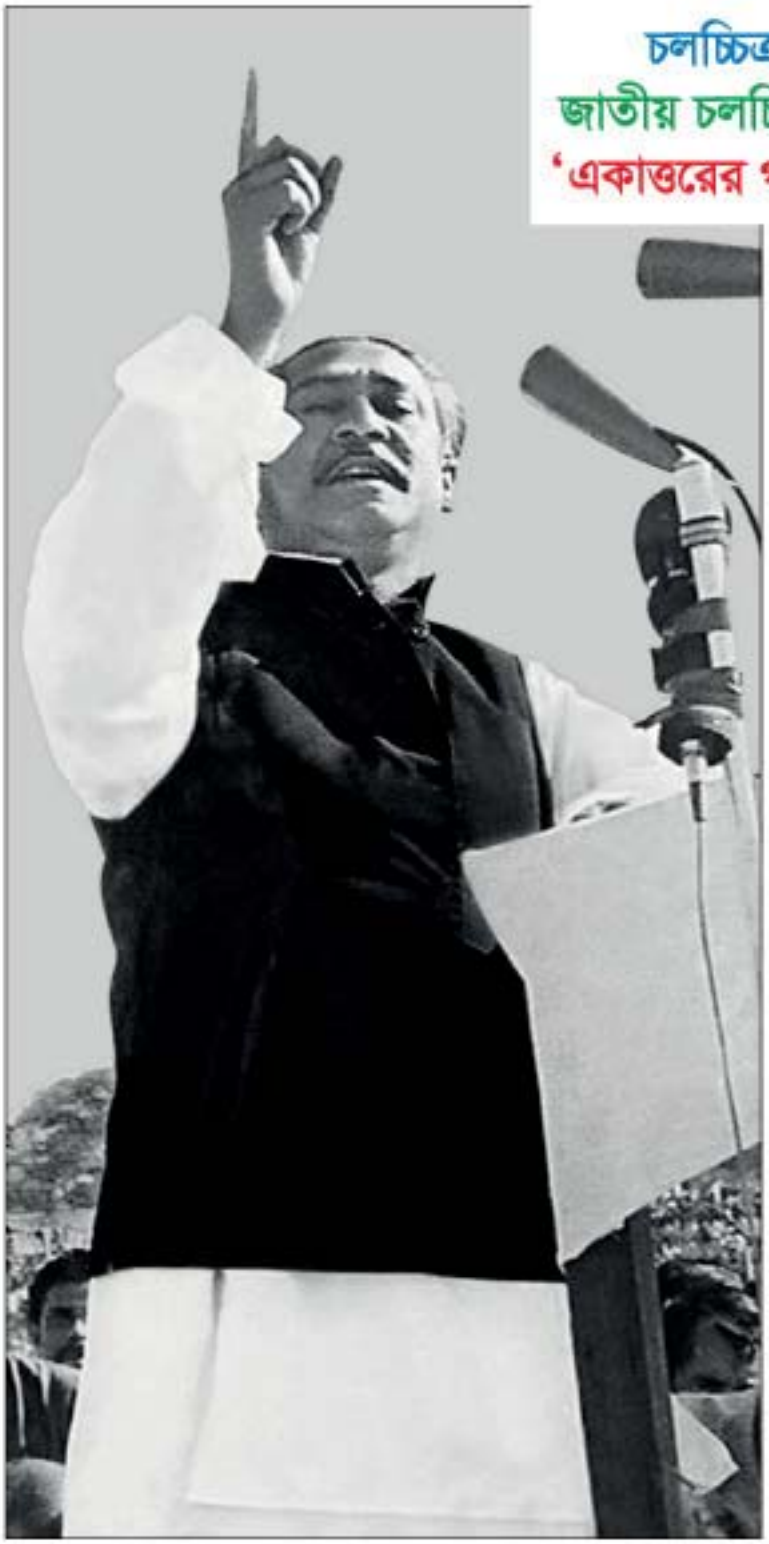

চলচ্চিত্র নির্মাণের গল্প
জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০১৫
'একাত্তরের গণহত্যা ও বধ্যভূমি'

মেজবাউল হক

১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ। পাকিস্তানি হানাদারবাহিনী তাদের এদেশীয় দোসরদের সহযোগিতায় শুরু করে বর্বরোচিত, পৈশাচিক গণহত্যা ও নির্যাতন। যার মাধ্যমে তারা দমন করতে চেয়েছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল গোটা দেশটাকে বধ্যভূমি আর গণকবরে পরিণত করা। পাকিস্তানি সেনা ও তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকার -আলবদর-আলসামসদের অনেক নির্মমতা-নৃশংসতাই আমাদের এখনো অজানা।

দেশের বিভিন্ন জনপদ ঘুরে নিবিড় অনুসন্ধানের মাধ্যমে গণহত্যার নানা ঘটনা ও বধ্যভূমি নিয়ে নির্মিত হয় প্রামাণ্যচিত্র 'একাত্তরের গণহত্যা ও বধ্যভূমি'। বাংলাদেশকে বধ্যভূমিতে পরিণত করার বাস্তবতাকে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে জনগণের নিকট তুলে ধরার জন্য চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর প্রযোজিত 'একাত্তরের গণহত্যা ও বধ্যভূমি' চলচ্চিত্রটি ২০১৫ সালের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য চলচ্চিত্র হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছে। নির্মম এই হত্যাকাণ্ড ও গণকবর নিয়ে গবেষণা করে স্ক্রিপ্ট লিখেছেন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র হাত থেকে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০১৫ গ্রহণ করছেন চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর-এর মহাপরিচালক মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন এবং পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রামাণ্য চিত্র 'একাত্তরের গণহত্যা ও বধ্যভূমি'র পরিচালক আবদুল্লাহ আল হারুন, ২৪ জুলাই ২০১৭

মুস্তাফা মাসুদ। আর দক্ষ হাতে পুরো বিষয়টিকে মাত্র ২৭ মিনিটে তুলে ধরেছেন আবদুল্লাহ আল হারুন তার সুনিপুণ নির্মাণের মাধ্যমে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রায়ের বাজার বধ্যভূমি, মিরপুর জল্লাদখানা, মিরপুর বাংলা কলেজ, মিরপুর শহিদ বুদ্ধিজীবী কবর স্থান ছাড়াও চট্টগ্রামের বিভিন্ন বধ্যভূমি, ময়মনসিংহের বিধবাপল্লি, রাজশাহী, বরিশাল, বাগেরহাট, খুলনার চুকনগর, রংপুর, বগুড়া, সিলেট, ফরিদপুরসহ প্রভৃতি বধ্যভূমির কথা উঠে এসেছে এই প্রামাণ্য চিত্রে। আরো এসেছে নির্মম এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ও শহিদ পরিবারের সদস্যদের স্মৃতিকথাও।

'একাত্তরের গণহত্যা ও বধ্যভূমি' চলচ্চিত্রটি নির্মাণের জন্য আবদুল্লাহ আল হারুন-এর নেতৃত্বে ৫ সদস্যের টিম খুঁজে বেরিয়েছেন বাংলাদেশের শহর-গ্রাম-গঞ্জে। কখনও রোদ, কখনও বৃষ্টি আবার কোথাও রাতের অন্ধকারেও ছুটেছেন পাকিস্তানি হানাদারদের নির্মমতার চিহ্ন বধ্যভূমির দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করার জন্য। কাজ করে গেছেন খেয়ে না খেয়ে। কখনও সকালে খেয়ে কাজ শেষে ফিরে রাতে খেয়েছেন। পুরো টিমের এ আত্মত্যাগ শুধু বাংলাদেশের ইতিহাসের এ নির্মম ঘটনাটি এ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার একটি মহৎ প্রয়াস। জানিয়েছেন আরো অনেক কিছু। ছোট্ট

বন্ধুরা তোমাদের জন্য তুলে ধরা হলো 'একাত্তরের গণহত্যা ও বধ্যভূমি' চলচ্চিত্রটি নির্মাণের অজানা কথা–

গণহত্যার নীরব সাক্ষী রাকুবির বধ্যভূমি

মুস্তাফা মাসুদ [গবেষণা ও চিত্রনাট্য] : লেখক জীবনে অনেক বিষয় নিয়ে লিখেছি। 'একাত্তরের গণহত্যা ও বধ্যভূমি' নিয়ে স্ক্রিপ্ট লেখা আমার জীবনে এক অনন্য লেখা। চোখের সামনে এখনও ভেসে উঠে ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিময় নানা দিনগুলি। ডিএফপি থেকে যখন এমন একটি স্ক্রিপ্ট লেখার প্রস্তাব পেলাম তখন চিন্তায় পড়ে গেলাম কীভাবে শুরু করব। এটি এমন একটি ঘটনা এ দেশের প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে গেথে আছে। অনেক বই আর নানা লেখা গবেষণা করে লেখাটি শেষ করলাম। লিখতে গিয়ে নিজেরই কলম থেমে যায়, চুপ হয়ে যাই। বসে থেকে শুরু করি আবার। হারুন সাহেব মাঝে মাঝে লেখার খবর জানতে চেয়েছেন আর তা আমাকে গতিশীল করেছে। তাঁর নিপুণ হাতের নির্মাণে এটি হয়েছে এক অনবদ্য চলচ্চিত্র। জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০১৫ পাওয়ায় নিজেকে কিছুটা সার্থক মনে হয়েছে। এমন একটি কাজ আমাকে দিয়ে হয়েছে, এজন্য আমি তৃপ্ত। ধন্যবাদ বাংলাদেশ সরকার ও সবাইকে, এ চলচ্চিত্রটির যথাযোগ্য মূল্যায়ন করার জন্য।

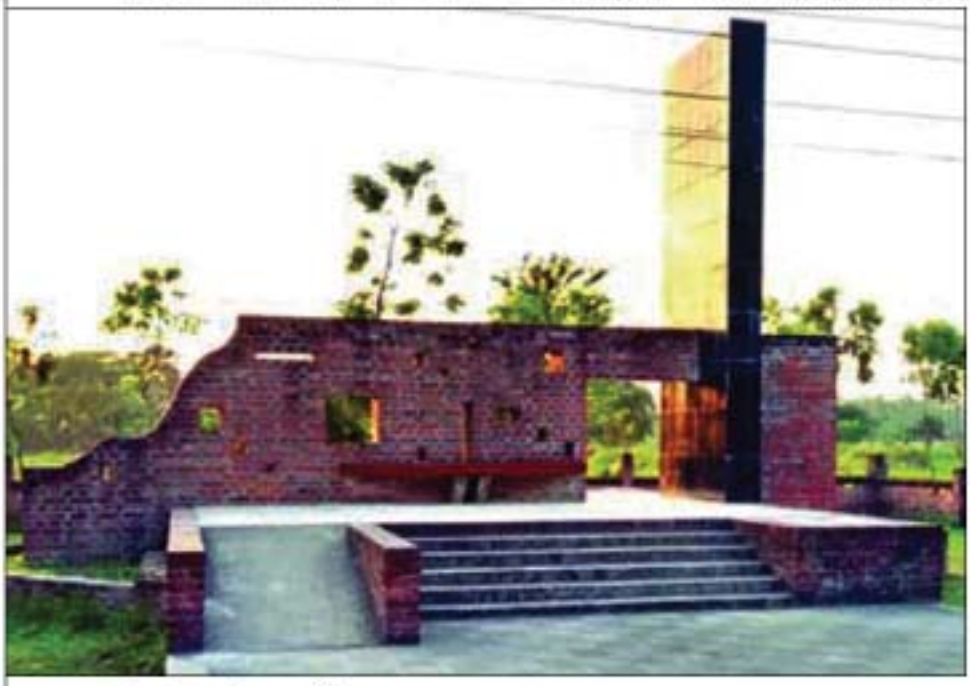

খুলনার চুকনগর বধ্যভূমি

আবদুল্লাহ আল হারুন [পরিচালনা] : আমার চাকুরি জীবনে সেরা কাজ এটি। ২০১২ সালে তৎকালীন মহাপরিচালক ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন এই প্রামাণ্য চিত্রটি নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীতে মহাপরিচালক হিসেবে যোগ দেন এ কে এম শামীম চৌধুরী। তিনি চলচ্চিত্রটি নির্মাণের জন্য তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব পেশ করেন। চলচ্চিত্রটি নির্মাণের কথা জেনে নিজেই আগ্রহ নিয়ে মহাপরিচালক মহোদয়কে বললাম। বলা যায়, এক রকম চেয়ে-ই নিলাম এটি নির্মাণের দায়িত্ব। তিনিও চলচ্চিত্রটি নির্মাণের দায়িত্ব আমাকে দেন। নির্মাণ শেষ হয় যখন, তখন মহাপরিচালক পদে এসেছেন মোহাম্মদ লিয়াকত আলী খান। তার সুচিন্তিত দিক নির্দেশনায় চলচ্চিত্রটির চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করি। প্রিভিউ কমিটির প্রতিটি সদস্য-এর ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন।

দায়িত্ব নেওয়ার পর ভাবতে লাগলাম কোথা থেকে শুরু করব। এমন একটি ঘটনা যা ঐতিহাসিক। সবার আগে লাগবে একটি ভালো স্ক্রিপ্ট। মনে পড়ে যায় লেখক মুস্তাফা মাসুদ-এর কথা। তিনি অনেক চমৎকার ভাবে ১৯৭১ সালের গণহত্যা ও বাংলাদেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে থাকা গণকবরের কথা তুলে এনেছেন। নেমে পড়ি পাকিস্তানিদের গণহত্যার বধ্যভূমিগুলোর চিত্র ধারণে। ডিএফপি'র ক্যামেরাম্যান শাহ আলম খোকা তার অভিজ্ঞতার দৃষ্টি দিয়ে ক্যামেরা বন্দি করেছেন প্রতিটি বধ্যভূমি। সাথে থাকা অন্য সহকর্মীরাও কষ্ট করেছেন দিন-রাত। বাজেট স্বল্পতার মধ্যেও সবাই কাজটি করেছেন প্রবল আগ্রহ ও ভালোবাসা দিয়ে। এতদিন ১৯৭১ সালের গণহত্যা ও বধ্যভূমি সম্পর্কে যা জেনেছি, আর কাজ করতে যা দেখলাম নিজেই বিস্মিত হয়েছি। কী নারকীয় হত্যাকাণ্ডই না ঘটিয়েছে আমাদের দেশীয় দোসরদের সহায়তায় পাকবাহিনী। এরকমই দুটি ঘটনা নবারুণ বন্ধুদের জন্য তুলে ধরলাম—

এক. খুলনার চুকনগরের বধ্যভূমি নিয়ে প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, এই গণকবরের পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় দেখতে পাই গণকবরের ভিতর কিসের একটা নড়াচড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে, এগিয়ে দেখি একজন মা অনেকগুলো লাশের সাথে পড়ে আছে। গায়ে রক্তমাখা। চেহারা তেমন একটা বুঝা যাচ্ছে না, পাশে শুয়ে থাকা শিশুটি মায়ের বুকের দুধ খাচ্ছে। দ্রুত গিয়ে বাচ্চাটি নিয়ে আসি। কিন্তু সে মুসলিম না হিন্দু পরিবারের ছিল তা বোঝার কোনো উপায় ছিল না। ধীরে ধীরে সে বড়ো হতে লাগল। কিন্তু তার কোনো পরিচয় পাওয়া গেল না। বর্তমানে সে বেঁচে আছে এবং সংসার করছে।

দুই. মিরপুর গোলারটেক বধ্যভূমির একটি ঘটনা, পাক হানাদার বাহিনী একজন মুক্তিযোদ্ধাকে পেট ফেড়ে একটি কুয়াতে ফেলে দেয়। সে কুয়াতে এর আগে অনেক বাঙালির লাশ ফেলেছে। সে যার উপরে পড়েছিল সে নিচ থেকে বলে তুমি কি জীবিত আছ ভাই? পারলে পালাও। উপরের জন বলে তুমি পালাবে না? সে বলল আমার হাত-পা চারটি ভেঙে ফেলে দিয়েছে, আমার উঠে দাড়ানোর উপায় নাই। উপরের জন কোনো রকমে গর্তের উপরে উঠে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। পরবর্তীতে গ্রামবাসীরা তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

শাহ আলম খোকা [ক্যামেরাম্যান] : ক্যামেরার চোখ দিয়ে জীবনে কত দৃশ্যই না ধারণ করেছি। যেগুলো নিজেকে মাঝে মাঝে নড়ে চড়ে দেয়, তেমনি একটি কাজ ১৯৭১ সালের গণহত্যার বধ্যভূমিগুলো ধারণ করা। প্রতিটি বধ্যভূমির কবর, নামফলক, স্মৃতিস্তম্ভ, পরিত্যক্ত স্থান নিখুঁত ভাবে তুলে আনার চেষ্টা করেছি। কখনও বাড়ির দেয়ালে, সীমানা প্রাচীরে, এমনকি গাছে উঠেও ছবি নিতে হয়েছে। কোনো কষ্ট মনে হয়নি, করে গেছি মনের আনন্দে। সহযোগী হিসেবে রাজু, আকরাম, নয়ন, জিকু, তনু এদের প্রতি অনেক কৃতজ্ঞতা। তাদের নিরলস আন্তরিকতা আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। ভালো লাগছে পুরস্কার পাওয়ায়। এমন একটি কাজে সম্পৃক্ত থাকাই নিজেকে ধন্য মনে করছি।

রাসেল চৌধুরী [সম্পাদনা] : ছবি আর ছবি। কোনটা রেখে কোনটি রাখি। টিমের কেউ বলে এটা কেউ বলে এটি না রাখলে না হয়। দেখছি আর অবাক হয়ে যাচ্ছি। কত খারাপ হলে মানুষ মানুষের সাথে এ রকম নির্মম আচরণ করে। কী সম্পাদনা করব, কম্পিউটারে হাত চলছে না। হারুন স্যার তাড়া দিচ্ছেন...।

গত ২৪ জুলাই ২০১৭ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য চিত্র হিসেবে 'একাত্তরের গণহত্যা ও বধ্যভূমি' -এর নির্মিত প্রতিষ্ঠান চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর-এর বর্তমান মহাপরিচালক মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন-এর হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

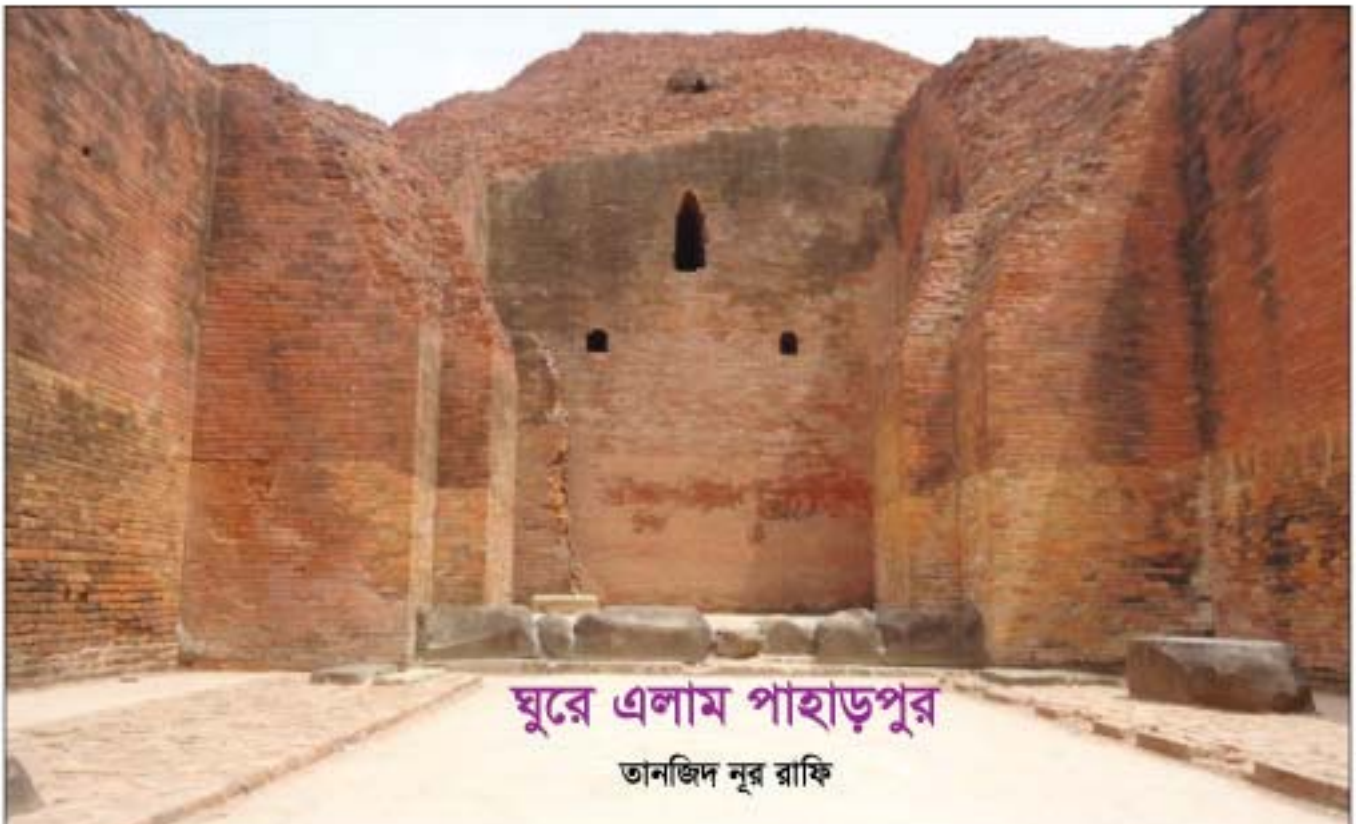

ঘুরে এলাম পাহাড়পুর

তানজিদ নূর রাফি

এতদিন শুধু বইপত্রেই পাহাড়পুর সম্পর্কে পড়েছিলাম। অবশেষে এই ঐতিহাসিক স্থানটি ঘুরে দেখার সুযোগ হলো। তাই সুযোগটা হাতছাড়া করতে পারলাম না!

যাত্রা শুরু

ঢাকার কল্যাণপুর বাস-স্ট্যান্ড থেকে সকাল এগারোটায় যাত্রা শুরু হলো আমাদের। আমি আর বাবা। বাংলাদেশের নর্থ ওয়েস্টে এই প্রথম যাত্রা আমার। যথা সময়ে বাস ছেড়ে দেয়া হলো। আমরা চলতে শুরু করলাম নওগাঁর পথে। শহর থেকে মফস্বল, মফস্বল থেকে গ্রাম, আবার শহর; যাত্রা পথের পুরোটা সময় জুড়ে এভাবেই সব দৃশ্য উপভোগ করছিলাম। দুই লেনের হাইওয়ে। বাস--ট্রাক-মিনিবাসমাইক্রোবাস সবকিছু চলছে সমান তালে। আমরাও এগিয়ে যাচ্ছি গন্তব্যের দিকে। যাত্রার মাঝপথে জুম্মার নামাজের বিরতি এবং ফুড ভিলেজে হালকা ভোজের বিরতি ছাড়া বাসটি আর কোথাও থামেনি।

সার্কিট হাউস

নওগাঁ পৌঁছাতে সাড়ে পাঁচটা বেজে গিয়েছিল। আমরা গিয়ে উঠলাম নওগাঁ সার্কিট হাউসে। একটি অপরিসর অথচ খুব সুন্দরভাবে সাজানো একটি সার্কিট হাউস। সন্ধ্যায় নাস্তা করে বেরিয়ে পড়লাম সার্কিট হাউস কম্পাউন্ড ঘুরে দেখতে। সব সার্কিট হাউসের মতো এখানেও ভিআইপি-দের 'সালাম নেওয়ার' জায়গা এবং একটি বিশাল বাগান, বাগানে নাম জানা-অজানা অনেক ফুলগাছ ও বিশাল ডাইনিং হল ছিল। আম, কাঁঠাল, নারকেল গাছও আলাদাভাবে চোখে পড়ল। সব মিলিয়ে থাকার জন্য এটি ছিল এক স্বর্গীয় স্থান! অন্তত নওগাঁ শহরটির সাথে তুলনা করলে তা-ই বলা যায়। কারণ, আশপাশে ভালো কোনো হোটেল বা রেস্ট হাউস নেই। আমরা যারা ঢাকায় থেকে অভ্যস্ত, এই শহরটিকে নিতান্তই মফস্বল বলে মনে হবে! যাই হোক, ছিমছাম পরিবেশ এবং কোলাহলমুক্ত রাস্তাঘাট দেখে বেশ ভালোই লেগেছিল। সেদিন বিকালবেলা খুব গরম পড়েছিল। কিন্তু রাতের আবহাওয়া ছিল যথেষ্ট সহনীয় পর্যায়ে। কারণ বাহিরে বাতাস ছিল। কম্পাউন্ডের ভেতর বাগানে হাঁটাহাঁটি করতে বেশ ভালো লাগছিল। নতুন জায়গা; অথচ আশপাশের পরিবেশ যে কাউকে আপন করে নেবে!

নওগাঁ শহর

পরের দিন সকাল সাতটায় বাবার সাথে হাঁটতে বের হলাম। শহরটিকে ঘিরে রেখেছে ছোটো যমুনা নদী। নদীটির দুই পার সিমেন্টের ব্লক ব্যবহার করে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। সার্কিট হাউস থেকে নদীটি দুই কিলোমিটার দূরে। যাবার পথে নওগাঁ জিলা স্কুলের

সামনে থামলাম। সেই ব্রিটিশ আমলে (১৯১৭ সালে) প্রতিষ্ঠিত স্কুলটি আজও দাঁড়িয়ে আছে সগৌরবে। স্কুলটির আকৃতি অনেকটা ইংরেজি L বর্ণের মতো। বিল্ডিংটা দেখেই বোঝা যায় এটা অন্তত একশ বছরের পুরোনো।

আবার হাঁটা শুরু করলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা নদীর পাড়ে পৌঁছে গেলাম। নদীর ওপরের ব্রিজটির ওপর দাঁড়িয়েই চমকে উঠলাম। যখনই কোনো ট্রাক সেটার ওপর দিয়ে যায় তখনই সেটা কাঁপতে থাকে। তাই দাঁড়িয়ে থাকার ভরসা পেলাম না। ব্রিজ পার করে আমরা বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত হাঁটলাম। আরো প্রায় ২০০ মিটার। এরপরই টমটমে করে ফিরে এলাম। বাঙ্গাবাড়িয়া উপজেলায় বহুতল ভবন খুব কমই দেখেছি। এখনো এখানে সেভাবে বিল্ডিং বানানো আরম্ভ হয়নি।

পাহাড়পুরের পথে...

ফিরে এসে নাস্তা করলাম। রুটি-মুরগি মাংস-সবজি। এরপরই 'অফিস পরিদর্শনে' বের হলাম। বাবা জেলা তথ্য অফিসে 'অফিসিয়াল' কাজগুলো সেরে ফেললেন। এরপরই আমরা রওনা হলাম পাহাড়পুরের উদ্দেশ্যে। বাঙ্গাবাড়িয়া হতে পাহাড়পুর প্রায় বিশ কিলোমিটার দূরে। আবার ফিরে গেলাম সেই চিরচেনা গ্রামীণ পরিবেশে। আমাদের মতে 'একটি পুকুর-একটি ঘর-আর গোলাভরা ধান'-এটিই হলো গ্রামীণ দৃশ্য। নওগাঁয় দৃশ্যগুলো অন্যরকম। সেখানে পুকুরের সংখ্যা খুবই কম। ঘর বাড়িগুলোর সাথে একটি সিমেন্টের উঠান। উঠানের কাছেই একটি চিমনি। প্রথমে ভেবেছিলাম এগুলো ইট পোড়ানোর জন্যে ব্যবহার করা হতো। পরে বুঝলাম এগুলো ধান সিদ্ধ করার কাজে লাগে। এছাড়াও পাহাড়পুর উপজেলায় এমন অনেক বাড়ি দেখেছি যেগুলো দেখে মনে হবে মাটির তৈরি কয়েক দশক পুরানো বাড়ি। আসলেই বাড়িগুলো শুধুই মাটি এবং ছনের তৈরি। বাঁশ অথবা পুরনো ইট সাজিয়ে গ্রিল দেওয়া হয়েছে। বাড়িগুলো একদমই সাদামাটা এবং সম্পূর্ণই হাতে তৈরি! হয়ত এখানকার উষ্ণ আবহাওয়ার জন্যে এরকম বাড়িতে বাস করা অধিক আরামদায়ক।

যাবার সময় চোখে পড়ল ধানক্ষেত। যতদূর চোখ যায়...! বাংলাদেশের ধান উৎপাদনে হয়ত এই জেলা অধিক এগিয়ে আছে। এরকম দিগন্তবিস্তৃত ধানক্ষেত জীবনে খুব কমই দেখেছি। ধানের পাশাপাশি এই অঞ্চল আলু, বাঁশ, পটল, আম ইত্যাদির জন্য বিখ্যাত।

নওগাঁর আরেকটি বিষয় চোখে পড়ার মতো। তা হলো মুরগির ফার্ম। এখানে মুরগি উৎপাদন করা হয় বহুতল ফার্মে। দোতলা-তিনতলা মুরগির ফার্মও দেখতে পেলাম।

পাহাড়পুর জাদুঘর

পাহাড়পুরে যখন পৌঁছলাম, তখন বেলা এগারোটা। মাথার ওপর গনগনে রোদ। প্রথমেই চলে গেলাম পাহাড়পুর জাদুঘরে। জাদুঘরটির সাজসরঞ্জাম এবং সংগ্রহশালা যে কারো মন কেড়ে নিতে পারে! পুরো জাদুঘর জুড়ে সাজানো রয়েছে ব্ল্যাক স্টোনে তৈরি মূর্তি, টেরাকোটা, মুদ্রা, অলংকার, মাটি ও সিরামিকের তৈজসপত্র, মাটির সিল, ব্যাংক, ঘড়া এবং আরো অনেক কিছু। প্রতিটির সময়কাল আনুমানিক পাঁচ থেকে পনেরো শতক। তবে তাদের মাঝে সবচেয়ে পুরনো বস্তুটি হলো ব্ল্যাক স্টোনের তৈরি একটি মাঝারি সাইজের বুদ্ধমূর্তি যা তৈরির সময়কাল দুই-তিন শতক। অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় দুই হাজার বছর পুরনো! এছাড়াও জাদুঘরটির মূল হলরুমেই পাহাড়পুরের একটি সম্পূর্ণ নকশা দেখতে পাওয়া যাবে।

বাবার সাথে লেখক

জাদুঘরের বাগান

পাহাড়পুর জাদুঘর থেকে বের হলেই যে জিনিসটি চোখে পড়বে তা হলো এক ফুল বাগান। বাগানটিতে আছে অসংখ্য জাতের ফুল গাছ আর ফুল গাছ থেকেও বেশি সংখ্যায় ভাস্কর্য! অন্য যে-কোনো ভাস্কর্যের তুলনায় এগুলো একদমই ভিন্ন। কারণ এগুলো বানানো হয়েছে মাঝারি সাইজের একেকটি গাছ কেটে কেটে। হাতি থেকে শুরু করে সোফাসেট(!) পর্যন্ত সবকিছুরই প্রতিকৃতি বানানো হয়েছে খুবই নিপুণভাবে। এক কথায়, ছবি তোলার জন্যে এই বাগানটিই টুরিস্টদের পছন্দের তালিকায় এক নম্বর।

সোমপুর মহাবিহার

হিমালয়ের দক্ষিণে সর্ববৃহৎ বিহারের পরিচয় বহন করে সোমপুর বিহার। পাল যুগের অবসান ঘটার পর পরিত্যক্ত বিহারটির ওপর বায়ুবাহিত ধুলোবালি জমতে জমতে এক বিশালাকার উঁচু ঢিপির রূপ ধারণ করে। সেখান থেকেই এ স্থানটির নাম হয় পাহাড়পুর। ১৯২৩-১৯৩৪ সাল পর্যন্ত সময়ের খননের ফলে এখানে একটি গুপ্তযুগের তাম্রশাসনসহ প্রস্তরলিপি, প্রস্তর ও ব্রোঞ্জ ভাস্কর্য, পোড়ামাটির ফলকচিত্র, উৎকীর্ণ লিপিযুক্ত রোদে শুকানো মাটির সিল, অলংকৃত ইট, বিভিন্ন ধাতব দ্রব্যাদি, রৌপ্যমুদ্রা, মাটির তৈরি বিভিন্ন পাত্র ইত্যাদি প্রচুর প্রত্ন- নিদর্শন পাওয়া যায়। উৎকীর্ণ লিপিযুক্ত সিলের পাঠোদ্ধার হতে জানা যায় যে, এ বিহারের প্রকৃত নাম ছিল সোমপুর মহাবিহার। এ মহাবিহার পাল বংশীয় দ্বিতীয় রাজা ধর্মপাল (৭৭০-৮১০ খ্রিঃ) কর্তৃক নির্মিত।

১৯৮২ সালে এবং পরবর্তী সময় পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারের কতিপয় ভিক্ষু-কক্ষে গভীর খননের ফলে নিম্ন আবাস স্তরে একটি পোড়ামাটির মূর্তির মাথা, একটি তাম্রমুদ্রা ও অন্যান্য দ্রব্যাদি পাওয়া যায়।

বৃহদাকার কক্ষবিশিষ্ট (১৬'X১৩'-৬") একটি ইমারতের ধ্বংসাবশেষ উক্ত খননে উন্মুক্ত হয়। বৃহদাকার এ ইমারতটি পাহাড়পুর তাম্রশাসনে উল্লিখিত জৈন বিহার বলে অনুমিত।

পাহাড়পুর বিহার উত্তর-দক্ষিণে ৯২২ ফুট এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৯১৯ ফুট। বিহারের উন্মুক্ত আঙ্গিনার চতুষ্পার্শ্বে চার বাহুতে ১৭৭টি ভিক্ষু কক্ষ আছে। অঙ্গনের কেন্দ্রস্থলে সুউচ্চ মন্দির এবং অন্যান্য স্থানে বহু সংখ্যক নিবেদন স্তূপ, কেন্দ্রীয় মন্দিরের অনুকৃতি ছোটো মন্দির, কূপ, রান্নাঘর, ভোজনশালা রয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্দিরটি ক্রুশাকৃতি এবং ধাপে ধাপে উঁচু করে নির্মাণ করা হয়েছে। পোড়ামাটির ফলকচিত্র দ্বারা

মন্দিরের বাইরের দেয়াল সুশোভিত করা হয়েছে।

হাজার বছর পুরনো একেকটি কক্ষ। হাজার বছর অবধি সংরক্ষণের অভাব এবং পরিত্যক্ত অবস্থার ফলে প্রতিটি কক্ষের ছাদ ধ্বসে গিয়েছে। অথচ এখানেই বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ একটা সময়ে বসবাস এবং ধর্মচর্চা করতেন। অনেক কক্ষে আমরা আজও চারকোণা কালো পাথর দেখতে পারি যেগুলো তাঁরা এক সময়ে 'টেবিল' হিসেবে ব্যবহার করতেন!

সবশেষে বলতেই হয় যে, এরকম একটি অজ পাড়াগাঁয়ে দু-হাজার বছর আগে কীভাবে একটি অতিকায় মন্দির তৈরি করা গেল, সেটি আজও এক রহস্যের বিষয়। তখন কে জানত এটিই দক্ষিণ এশিয়ার সর্ববৃহৎ বৌদ্ধ মন্দির হবে!

মনে রেখো

পাহাড়পুর উপজেলা খুবই

পরিত্যক্ত সোমপুর বিহার

৯ম শতাব্দির শেষ পর্ব হতে শুরু করে কতিপয় বিদেশি রাজাগণ এবং দিব্য নামে এদেশীয় এক কৈবর্ত সামন্ত নরপতি কর্তৃক পাল সাম্রাজ্য বারবার আক্রান্ত হয়। এভাবে পুনঃ আক্রমনের ফলে সোমপুর বিহারের যথেষ্ট ক্ষতি সাধিত হয়। প্রায় একই সময় বঙ্গাল সৈন্যগণ পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার ও মন্দির পুড়িয়ে দেন। খ্রিষ্টীয় ১২ শতকে বাংলাদেশ সেন রাজাদের হস্তগত হয়। সেন রাজারা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের গোঁড়া সমর্থক ছিলেন। এভাবে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে পাহাড়পুরের বৌদ্ধবিহার ও মন্দির ক্রমে ক্রমে পরিত্যক্ত হয়। ভিক্ষু ও পূজারিগণ পাহাড়পুর ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যান।

মন্দিরের আশপাশের কক্ষ

পাহাড়পুরে আমরা আজ ইটের তৈরি চারকোণা যে সকল ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাই এগুলো আসলে

প্রত্যন্ত অঞ্চল। তবে আশার বিষয় হলো এখানে খুবই ভালো রেস্ট রুমের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রয়োজনে সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়া যায়। মূল শহর থেকে এই এলাকা যথেষ্ট বিচ্ছিন্ন বলে এখানে অন্যান্য সুযোগ সুবিধা খুব সীমিত। তাই এখানে পাড়ি জমাতে হলে ভালোভাবে প্রস্তুতি নিয়ে আসাই বুদ্ধিমানের কাজ। গরমকালে এখানে ঘুরতে এলে সঙ্গে অবশ্যই প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানি আর মাথায় পরার ক্যাপ নিয়ে আসবে।

একাদশ শ্রেণি, বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আবদুর রউফ স্কুল অ্যান্ড কলেজ, পিলখানা, ঢাকা।

দুরন্ত মেয়ে সুরমা

মীম নোশিন নাওয়াল খান

ভারতের আসামে রয়েছে নাগা-মণিপুর পাহাড়। অনেক অনেক দিন আগে থেকে এই পাহাড় একা একা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এই নিয়ে তার খুব মন খারাপ। তার মাথার উপর দিয়ে কত পাখি উড়ে যায়, কত মেঘ ভেসে যায়- তারা সবাই কত জায়গায় ঘুরতে যায়। পাখিরা আর মেঘেরা এসে তাকে নানান দেশের গল্প শোনায়। তারা রাজকন্যার গল্প বলে, কৃষকের পাকা ধান কাটার গল্প বলে, আরো কত গল্প বলে!

অথচ নাগা-মণিপুর পাহাড় তাদের মতো করে ঘুরে বেড়াতে পারে না। এত সুন্দর সুন্দর দৃশ্যের কিছুই সে দেখতে পারে না। তাই সে প্রতিদিন অপেক্ষা করে থাকে কখন পাখিরা আর মেঘেরা এসে গল্প শোনাবে। কিন্তু পাখি আর মেঘগুলোর খুব ব্যস্ততা। তারা গল্প শোনানোর সময়ই পায় না। পাহাড়েরও আর সময় কাটে না। সে একা একা দাঁড়িয়ে থাকে।

এমন চলতে চলতে একদিন পাহাড়টা একটা বুদ্ধি বের করল। সে ঠিক করল, তার কোল থেকে যেই জলরাশি নেমে গেছে, তাকে সে পাঠিয়ে দেবে বিশ্ব দেখতে। সে জলরাশি নদী হয়ে কুলকুল করে বয়ে যাবে। নানা জায়গায় যাবে, অনেক কিছু দেখবে আর সন্ধ্যা বেলায় তাকে সেসব গল্প শোনাবে।

যেই ভাবা, সেই কাজ। নাগা-মণিপুর পাহাড় তার দক্ষিণ অংশের জলরাশিকে পাঠিয়ে দিলো বিশ্ব দেখতে। সেই জলরাশি নদী হয়ে সমতল ভূমিতে নেমে এল। লোকে তার নাম দিল বরাক নদী।

বরাক নদী পৃথিবী দেখতে বেরিয়ে পড়ল। চলতে চলতে সে পৌঁছে গেল বাংলাদেশের সিলেট জেলার সীমান্তে। নদীর কী আর সীমান্তের বাধা মানলে চলে? সে সোজা সীমান্ত পেরিয়ে ঢুকে পড়ল সিলেটে। সিলেটে ঢোকার সময় সে কোনদিকে যাবে- তা নিয়ে দ্বিধায় পড়ে গেল। তাই সে বুদ্ধি করে দুই ভাগ হয়ে দুটো নদীকে বাংলাদেশে পাঠালো। তার একটার নাম সুরমা, অন্যটা কুশিয়ারা।

বরাক নদী যখন বাংলাদেশে আসে, সেই সময় এক রাজা ছিল। তার নাম ছিল ক্ষেত্রপাল। তার রানির নাম ছিল সুরমা। রাজা তার রানিকে খুব ভালোবাসতেন। তাই অনেকেই বলে, রানির নামেই নদীটার নাম দিয়েছিলেন রাজা ক্ষেত্রপাল।

সুরমা নদী তো বাংলাদেশে ঢুকে পড়ল। এবার সে উত্তর দিকে সীমান্ত ধরে চলতে শুরু করল। তারপর

সে চলল পশ্চিম দিকে। কিন্তু সুরমা ছিল খুব অস্থির আর চঞ্চল। তাই সে এক দিকে চলতে পারল না। আবার পথ পালটে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে বেঁকে গেল। এভাবে সে সিলেট শহরের দিকে প্রবাহিত হতে লাগল। তারপর আবার সে সিলেট পেরিয়ে উত্তর-পশ্চিমে চলতে শুরু করল। এবার সে চলতে লাগল সুনামগঞ্জ শহরের দিকে। সুনামগঞ্জ থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে পাইন্দা নামক একটা জায়গায় এসে সুরমা নদী দুই ভাগ হয়ে গেল। এর প্রথম শাখাটা চলতে চলতে দক্ষিণ মদনা নামক একটা জায়গায় চলে এল। এখানে এসে তার সঙ্গে আবার দেখা হয়ে গেল কুশিয়ারা নদীর।

তখন দুই নদীর সে কী আনন্দ! তারা একসাথে কত গল্প করল, কত হাসল, কত আনন্দ করল!

এই প্রথম শাখাটা এক সময় সুরমা নদীর মূল প্রবাহ হলেও এখন নদীটা শুকিয়ে মৃতপ্রায় হয়ে গেছে। তাই একে সবাই মরা সুরমা বলে ডাকে।

আর সুরমার দ্বিতীয় শাখাটা পাইন্দা থেকে ৮ কিলোমিটার প্রবাহিত হয়ে উত্তর-পশ্চিম দিকে বাঁক নিয়ে ৯ কিলোমিটার এগিয়ে আবার দক্ষিণ-পশ্চিমে বেঁকে গিয়ে লালপুরে বাইলাই নদীতে গিয়ে পড়ল। এই শাখাটা চলতে চলতে এক সময় মেঘনা নদীর সঙ্গে গিয়ে মিশল। বরাক নদী থেকে ভাগ হওয়ার পর মেঘনা নদীতে মিশে যাওয়া পর্যন্ত সুরমার দৈর্ঘ্য হলো ৩৫৫ কিলোমিটার।

সুরমা অস্থির আর চঞ্চল মেয়ে হলেও তাকে বাংলার মানুষেরা খুব ভালোবেসে ফেলেছিল প্রথম থেকেই। তাই তো তার তীরে নগর-বন্দর ও লোকালয় গড়ে তুলেছিল মানুষ। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যও সিলেটের মানুষের প্রধান মাধ্যম হয়ে দাঁড়ালো সুরমা নদী। সুরমা নদীর পাড়ে বোনা হতো চমৎকার শীতলপাটি। এই শীতলপাটির খ্যাতি ছড়িয়ে গেল সারা বাংলায়। এছাড়া বেতের তৈরি আসবাবপত্রের জন্যও সুরমা তীরের মানুষের ছিল দারুণ সুখ্যাতি।

দিনে দিনে যদিও সুরমা পাড়ের মানুষগুলো অন্য জীবিকা খুঁজে নিয়েছে, তবুও এখনো সারা বাংলার মানুষের মুখে মুখে ফেরে সুরমা পাড়ের শীতলপাটির গল্প।

সুরমা নদীকে বাংলার মানুষেরা খুব ভালোবাসলে কী হবে, বর্ষাকালে কিন্তু সুরমা নদী খুব রেগে যায়। এ সময় সুরমা নদীতে বন্যা হয়। মে মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত গড়ে ৩০ হাজার কিউসেক পানি অপসারণ হয় সুরমা থেকে।

সুরমা নদীকে খুব ভালোবাসে বলে বাংলার মানুষেরা তাকে নিয়ে অনেক গল্প বলে থাকে। বলা হয়, হজরত শাহজালাল তার বাহিনী নিয়ে সুরমার পাড়ে উপস্থিত হলে রাজা গৌড়গোবিন্দ নদীর সব নৌকা চলাচল বন্ধ করে দেন। তখন জায়নামাজে চেপে এই নদী পার হয়েছিলেন হজরত শাহজালাল।

১৩৪৬ খ্রিষ্টাব্দে হজরত শাহজালালের সঙ্গে দেখা করার জন্য সুরমা নদী পেরিয়ে আসেন ইতিহাসের উজ্জ্বল এক ভ্রমণপিপাসু ব্যক্তি ইবনে বতুতা।

সুরমা নদী বাংলার দুষ্টু ও দুরন্ত মেয়ে। কিন্তু তবুও এই চঞ্চল মেয়েটাকে খুব খুব ভালোবাসে সারা বাংলা। তাই তো এখনো তার বুকে পাল উড়িয়ে মাঝি গেয়ে ওঠে ভাটিয়ালি গান, আর জলকেলিতে ব্যস্ত হয় পাখিদের ঝাঁক। [নদী নিয়ে ধারাবাহিক]

একাদশ শ্রেণি, ভিকারুন নিসা নূন স্কুল, ঢাকা।

সুরমা নদীর উপরে নির্মিত রেল ব্রিজ

মিশুর বোবায় ধরা

অনিক শুভ

মাঝরাতে হঠাৎ পাড়ার লোকের চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল। ছোটো বোন টুনি এসে বলল, 'ভাইয়া, তুমি এখনো ঘুমাচ্ছো? সবাই তো রহিম চাচার বাড়ির দিকে দেখছি ছুটে ছুটে যাচ্ছে।

– কেন? কী হয়েছে এত রাতে?

– শুনেছি, উনার ছেলে মিশুকে নাকি বোবায় ধরেছে।

– কী বলিস! তাড়াতাড়ি চল।

রহিম চাচার ছেলে মিশুকে প্রায়ই সুস্থ দেখি। মাঠে খেলতে দেখি। মাঝে মাঝে ব্যাট আর বল নিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'ভাইয়া খেলবেন নাকি? আমি প্রায় বলি, 'না রে... আজ খেলব না। তোরা খেল। অন্যদিন খেলব'। আমি মাঠের এক পাশে বসে বসে ওদের খেলা দেখি। কাল বিকেলেও মিশুকে দেখেছি স্কুল থেকে ফিরতে। সাইকেলের ঝুড়িতে বই। এই রকম ভালো ছেলেকে বুঝি বোবায় ধরেছে!

রহিম চাচার বাড়ি গিয়ে দেখি ঘর ভর্তি মানুষ। অনেকে উঠানে দাঁড়িয়ে আছে। অনেক ঠেলেঠুলে ভিতরে ঢুকলাম। মিশুর খাটের কাছে গিয়ে দেখি মুখটা কেমন জানি বীভৎস হয়ে আছে। গোঙাচ্ছে। কেউ ওর সামনে যেতে চাচ্ছে না। ভয় পাচ্ছে। আমি সাহস করে ওর দিকে এগিয়ে গেলাম। তখনই টুনি বলল, 'ভাইয়া, তুমি যেও না। তোমাকেও ওর মতো যদি বোবায় ধরে?'

আমি কিছু বলার আগে গ্রামের সবাই ওর সাথে তাল মিলিয়ে বলতে শুরু করল– তুমি যেও না বাবা। ভালো ছেলে তুমি। তোমাকেও বোবায় ধরবে।

আমি সবার কথা উপেক্ষা করে মিশুর খাটের উপর গিয়ে বসলাম। যেই ওকে স্পর্শ করলাম, সাথে সাথে ওর গোঙানি বন্ধ হয়ে গেল। চোখগুলো হাঁসের ডিমের মতো করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। মাথা ঘুরিয়ে আচমকা এলাকার সবাইকে দেখে ভয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল:

– কী হয়েছে ভাইয়া? আমাদের বাড়িতে এত লোকজন কেন?

– কিছু হয়নি মিশু। ওরা এখন চলে যাবে। তুমি শুয়ে পড়ো। সকালে আবার তোমাকে স্কুলে যেতে হবে।

মিশু চুপ করে রইল। এখনো স্বাভাবিক হতে পারেনি ও। স্বাভাবিক হওয়ার আগে আমি সবাইকে বললাম:

– ভাই চলেন... চলেন... অনেক রাত হয়েছে। মিশুর কিছু হয়নি। সবাই যার যার বাড়ি চলে যান।

আস্তে আস্তে ভিড় কমতে শুরু করল। সবাই যার যার বাড়ি চলে গেলেন। আমিও মিশুকে ঘুমাতে বলে টুনিকে সাথে নিয়ে বাসায় চলে আসি।

এরপর থেকে প্রায় কিছুদিন পরপর রাতের বেলা মিশুর এই বোবায় ধরা সমস্যা হয়। সবাই ছুটে যায় রহিম চাচার বাড়িতে। আগের মতো কেউ যখন মিশুর দিকে যেতে চায় না, একমাত্র আমিই ওকে শান্ত করি। অবাক করার ব্যাপার হলো, আমি যখনি মিশুকে গিয়ে ধরি, সাথে সাথে ওর গোঙানি বন্ধ হয়ে যায়। অনেক সময় ধরে চিৎকার করা থেমে যায়।

গ্রামের এখন প্রায় অনেকে বলাবলি শুরু করে দিয়েছে যে, রাতের বেলায় নাকি মিশুকে জিনে ধরে। আর আমার কাছে নাকি ওর চেয়ে অনেক বড়ো শক্তিশালী জিন আছে। তাই আমি ধরার সাথে সাথে মিশুর গোঙানি, ঝাঁকুনি, চিৎকার এসব থেমে যায়। আমি অনেক সময় এসব শুনেও চুপ করে থাকি। কারণ গ্রামের অনেকেই অশিক্ষিত। ওদের বোঝানো বড়ো দায়।

সব ভেবে দেখলাম মিশুর এই অবস্থার কথা পাশের গ্রামের ডাক্তারবাবুকে জানানো দরকার। ফোনে সব বুঝিয়ে বললাম উনাকে। ডাক্তারবাবু অনেক ভালো

মানুষ। আমার সব কথা মন দিয়ে শুনলেন। এরপর বললেন:

– হুম... মিশুর ব্যাপার কিছুটা আমি বুঝেছি। তবে আরেকটু ক্লিয়ার হওয়া দরকার। যখনই এই ধরনের সমস্যা হবে সাথে সাথে আমাকে ফোন করবে। আমি চলে আসব রহিম চাচার বাড়ি।

– অনেক ধন্যবাদ ডাক্তারবাবু।

হঠাৎ এক রাতের বেলা দরজা নক করার আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল আমার। দরজা খুলে দেখি রহিম চাচা।

– কী চাচা? এত রাতে যে?

– বাবা, তুমি তাড়াতাড়ি চলো। মিশুকে আবার বোবায় ধরছে।

– ঠিক আছে চাচা। আপনি বাড়ি যান। আমি আসছি।

– তাড়াতাড়ি এসো বাবা।

আমি সাথে সাথে ফোন করলাম ডাক্তারবাবুকে। উনি বললেন, ' আমি বের হচ্ছি। তুমিও তাড়াতাড়ি এসো'।

আজ একটা এক্সপেরিমেন্ট হবে, পাড়ার লোকের ভুল ভাঙবে, তাই আমি দেরি না করেই রহিম চাচার বাড়ি চলে গেলাম। গিয়ে দেখি ডাক্তারবাবু এখনো আসেনি। ফোন করলাম। লাইন কেটে দিল। উঠোনের দিকে তাকাতেই দেখলাম উনি চলে এসেছেন, তাই লাইন কেটে দিচ্ছিলেন। এরমধ্যে গ্রামের অনেক লোক জড় হলো। আমাদের দেখছে। ডাক্তারবাবু যেই মিশুকে ধরলেন মিশুর গোঙানি থেমে গেল। ঘুম ভেঙে গেল।

সাথে সাথে গ্রামের অনেকে বলতে শুরু করে দিলেন যে- আমার মতো ডাক্তারবাবুর কাছেও অনেক শক্তিশালী জিন আছে। তাই ডাক্তারবাবু মিশুকে ধরার সাথে সাথে ওর গোঙানি থেমে গেছে। এরমধ্যে অনেকে আবার আমার আর ডাক্তারবাবুর পা ধরে সালামও করা শুরু করে দিয়েছে।

গ্রামবাসীর এমন আচরণ দেখে ডাক্তারবাবু অনেক রেগে গেলেন। তিনি সবাইকে ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে দিলেন। তারপর বলতে শুরু করলেন:

– অনেকে ঘুমের মধ্যে ভয়ংকর স্বপ্ন দেখে শিহরে উঠেন। হয়ত কেউ তাকে মারতে আসছে আর তিনি ভয়ে চিৎকার করছেন। কিন্তু শব্দ বেরোচ্ছে না। কে যেন গলা টিপে ধরেছে। হাত-পা আড়ষ্ট হয়ে আসছে। এই সময় মুখ থেকে এক ধরনের গোঙানির শব্দ বেরোয়। মনে হয় কথা আটকে আসছে। একে বোবায় ধরা বলে। যেটা মিশুর ক্ষেত্রে হয়েছে। এই সময় পাশের যে-কোনো ব্যক্তির শরীরের স্পর্শ পেলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

সব শুনে আমি বললাম:

– আচ্ছা ডাক্তারবাবু, ঘুমের মধ্যে শ্বাসপ্রশ্বাসে কোনো সমস্যা হলে এরকম হতে পারে?

– হুম হতে পারে।

– আর কী কোনো কারণ আছে?

– দু'টি সমস্যার কারণে এই রকম হতে পারে।

– কী? কী?

– প্রথমত, গলার পেছনের দিকে শ্বাসনালীর মুখে মাংসপেশি ঝুলে পড়ে বায়ু চলাচলে বাধা সৃষ্টি করলে এরকম হতে পারে।

– আর দ্বিতীয়টি?

– দ্বিতীয়টি হলো, স্বয়ংক্রিয়ভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস চালিয়ে যাওয়ার জন্য মস্তিষ্ক থেকে সংকেত প্রেরণ কয়েক মুহূর্তের জন্য বন্ধ থাকলেও এরকম হতে পারে।

– মিশুর কী কোনো চিকিৎসার প্রয়োজন?

– সাধারণত বোবায় ধরা বন্ধ করার জন্য কোনো চিকিৎসার দরকার হয় না। তবে ঘন ঘন হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

– মিশুকে দেখে আপনার কী মনে হলো ডাক্তারবাবু?

– ওর তেমন সমস্যা না। চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে না ওকে। এমনিতে ঠিক হয়ে যাবে।

– অসংখ্য ধন্যবাদ ডাক্তারবাবু। আমাদের গ্রামের সকলের ভুল ভাঙিয়ে দেওয়ার জন্য।

ডাক্তারবাবুকে বিদায় জানিয়ে গ্রামের সবার উদ্দেশ্যে বললাম:

– কী ব্যাপার? আপনাদের সবার ভুল ধারণা এইবার ভাঙল তো? এইবার তো বুঝলেন এইসব জিন-ভূতের কাজ না।

রহিম চাচা বলে উঠলেন:

– তুমি আমাদের জন্য অনেক করেছ বাবা। তুমি না থাকলে আমাদের ভুল ভুলই রয়ে যেত।

– কী যে বলেন চাচা। আমরা একই গ্রামের। একে অন্যের প্রয়োজনে, একে অপরের দিকে এগিয়ে আসব। আমার জন্য দোয়া করবেন চাচা।

– অনেক বড়ো হও বাবা।

এক এক করে সবাই যার যার বাড়ি চলে গেল। মিশু এখন ডাক্তারের পরামর্শ মেনে চলে। তাকে আর বোবায় ধরেছে এমনটা শুনি না।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগ

সুলতানা বেগম

ছোট্ট বন্ধুরা তোমরা কি জানো, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর স্বপ্ন কি ছিল? তাঁর স্বপ্ন ছিল-'সোনার বাংলা গড়া'। দেশের প্রতিটি মানুষ আশ্রয় পাবে, খাদ্য পাবে, শিক্ষা পাবে ও উন্নত জীবনের অধিকারী হবে। বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্ন বাস্তবে রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দারিদ্র্য বিমোচনে ১০টি বিশেষ উদ্যোগ হাতে নিয়েছেন। এই উদ্যোগ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে ২০২১ সালের মধ্যে ক্ষুধামুক্ত মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে সরকার। প্রধানমন্ত্রীর এই ১০টি বিশেষ উদ্যোগ সংক্ষিপ্তাকারে তোমাদের জন্য তুলে ধরলাম হলো–

একটি বাড়ি একটি খামার ও পল্লি সঞ্চয় ব্যাংক

'শেখ হাসিনার উপহার/একটি বাড়ি একটি খামার/বদলাবে দিন তোমার আমার'–এই স্লোগান নিয়ে গ্রামের দরিদ্র মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে যাত্রা শুরু হয় 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্পের। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো নিজস্ব পুঁজি গঠন ও বিনিয়োগে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও জীবিকায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসন ও টেকসই উন্নয়ন। ১লা জুলাই ২০১৬ থেকে 'পল্লি সঞ্চয় ব্যাংক' নামে যাত্রা শুরু করে এই প্রকল্প।

আশ্রয়ণ প্রকল্প

ঘূর্ণিঝড় ও নদীভাঙনে ছিন্নমূল অসহায় পরিবারের পুনর্বাসন এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ঋণ ও প্রশিক্ষণদানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে তোলা আশ্রয়ণ প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য। এই প্রকল্পের স্লোগান হচ্ছে– 'আশ্রয়ণের অধিকার/শেখ হাসিনার উপহার'।

ডিজিটাল বাংলাদেশ

'শেখ হাসিনার উপহার/ডিজিটাল সরকার'–এই স্লোগান নিয়ে যাত্রা শুরু করে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' প্রকল্প। এর মূল লক্ষ্য হলো–জনগণের দোরগোড়ায় অনলাইন রাষ্ট্রীয় সেবা পৌঁছানো। যাতে ভোগান্তিবিহীন, দুর্নীতিমুক্ত ও স্বচ্ছতার সাথে স্বল্প সময়ে জনগণের কাছে সেবা পৌঁছানো, মোবাইল ও ইন্টারনেট সেবা সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে পৌঁছানো এবং সরকারি যাবতীয় তথ্য ও সেবাকে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জনগণের কাছে তুলে ধরা।

শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি

'শিক্ষিত জাতি সমৃদ্ধ দেশ/শেখ হাসিনার বাংলাদেশ'–এই স্লোগানের মধ্য দিয়ে শুরু হয় 'শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি' প্রকল্প। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে–স্কুলগামী

শতভাগ শিশুকে বিদ্যালয়ে আনয়ন, মাধ্যমিক পর্যায়ে বিনামূল্যে পাঠ্যবই সরবরাহ, মেয়েদের বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ প্রদান, মেয়েদের শিক্ষা সহায়তা উপবৃত্তি প্রদান, মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা সহায়তা বৃত্তিপ্রদান, পর্যায়ক্রমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ জাতীয়করণ করা এবং আইটি-নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনসহ শ্রেণিকক্ষসমূহে মাল্টিমিডিয়া ও ইন্টারনেট সংযোগ নিশ্চিতকরণ।

নারীর ক্ষমতায়ন

'শেখ হাসিনার প্রতিশ্রুতি/নারী জাগরণে অগ্রগতি'-এই স্লোগান নিয়ে সর্বক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি এবং নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করার জন্য 'নারীর ক্ষমতায়ন' উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এছাড়া নারীর সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে প্রণয়ন করা হয় 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা-২০১১'।

ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ

'শেখ হাসিনার উদ্যোগ/ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ'-এই স্লোগান নিয়ে যাত্রা শুরু করে 'ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ' প্রকল্পের। এর লক্ষ্য আর্থসামাজিক ও মানব উন্নয়নে ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছানো। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতা গ্রহণের পর দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক অগ্রগতি সাধন করে। তাঁর দূরদর্শী ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের ফলে দেশের সর্বত্রই এখন বিদ্যুতের আলো পৌঁছে গেছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি সৌরবিদ্যুৎ, উইন্ডমিল ও বায়োগ্যাস থেকেও বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে।

কমিউনিটি ক্লিনিক ও মানসিক স্বাস্থ্য

'শেখ হাসিনার অবদান/কমিউনিটি ক্লিনিক বাঁচায় প্রাণ'-এই স্লোগান নিয়ে শুরু হয় 'কমিউনিটি ক্লিনিক ও মানসিক স্বাস্থ্য' প্রকল্প। এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে-গ্রামীণ

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা। এর আওতায় সন্তান সম্ভবা মায়েদের মাতৃত্বকালীন যাবতীয় সেবা নিশ্চিত করা, প্রজনন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনার সকল ধরনের সেবা প্রদান করা, জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন, নতুন বিবাহিত দম্পতি ও সন্তান সম্ভবা মায়েদের নিবন্ধিত করা, মা ও শিশুর খাদ্য ও পুষ্টির বিষয়ে সহায়তা প্রদান করা এবং জটিল স্বাস্থ্য সমস্যার ক্ষেত্রে উন্নত চিকিৎসার জন্য উপজেলা ও জেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রেরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি

'শেখ হাসিনার বারতা/গড়ো সামাজিক নিরাপত্তা'-এই স্লোগান নিয়ে শুরু হয় 'সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি' প্রকল্প। এর লক্ষ্য হচ্ছে-বয়স্ক, অক্ষম

জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা নারীদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধান, গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টি ইত্যাদি সম্পর্কে উদ্বুদ্ধকরণ, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মাসিক ভাতার আওতায় আনা এবং ভূমিহীন ও ছিন্নমূল পরিবারের জন্য সহায়তার ব্যবস্থা করা।

পরিবেশ সুরক্ষা

'শেখ হাসিনার নির্দেশ/জলবায়ু সহিষ্ণু বাংলাদেশ' –এই স্লোগান নিয়ে শুরু হয় 'পরিবেশ সুরক্ষা' প্রকল্প। দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জনগোষ্ঠীর বসবাস উপযোগী পরিবেশ নিশ্চিতকল্পে মোট বনভূমির পরিমাণ সম্প্রসারণ, বন ও বনজ সম্পদের উন্নয়ন, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও শনাক্তকরণ, দারিদ্র্য বিমোচন, পরিবেশ দূষণ রোধ, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা এবং টেকসই পরিবেশ উন্নয়ন এই কর্মসূচির প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

বিনিয়োগ বিকাশ

'শেখ হাসিনার নির্দেশ/বিনিয়োগবান্ধব বাংলাদেশ' –এই স্লোগান নিয়ে 'বিনিয়োগ বিকাশ' প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। প্রধানমন্ত্রী দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য বেশকিছু যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এর মধ্যে বিদ্যুৎ ঘাটতি দূর করে উৎপাদন ক্ষমতা ১৫৩৫১ মেগাওয়াটে উন্নীত করেছে। যোগাযোগ খাতের উন্নয়ন বিনিয়োগের নতুন দ্বার উন্মোচিত করেছে। মহাসড়কসমূহ চার লেনে উন্নীত হয়েছে। চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্র বন্দর অত্যাধুনিক সমুদ্র বন্দর হিসেবে গড়ে উঠেছে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট নারী-পুরুষের সমতা

জান্নাতে রোজী

শিশু-কিশোর বন্ধুরা আজ তোমাদেরকে এমন একটি বিষয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবো যেটি তোমাদের কাছে প্রথমে একটু কঠিন মনে হলেও পরে ঠিকই ভালো লাগবে। কারণ এটি তোমার-আমার কল্যাণের জন্যই গৃহীত হয়েছে। এটি সম্পর্কে জানা, এর সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করা আমাদের সবার উচিত।

জাতিসংঘের উদ্যোগে সকল মানুষের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে একটি অধিকতর টেকসই ও সুন্দর বিশ্ব গড়ার প্রত্যয় নিয়ে সার্বজনীনভাবে একগুচ্ছ সমন্বিত কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। এতে ১৭টি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)'র ও ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি)'র মেয়াদ শেষে ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা

(এসডিজি) গৃহীত হয়। এসডিজির সংশ্লিষ্টতা ও ব্যাপকতা এমডিজি'র চেয়ে অনেক বেশি। প্রতিটি রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এসডিজি'র সফল বাস্তবায়নের ওপর। এসডিজি'র সফলতার মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য দূরীকরণ, ন্যায় ও সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতসমূহ মোকাবিলা করে একটি টেকসই ও নিরাপদ বিশ্ব আগামী ১৫ বছরের মধ্যে নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

এসডিজি'র এই মহাপরিকল্পনা প্রণয়নে বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে। মোট ১৭টি অভীষ্টের মধ্যে ১১টি অভীষ্টের ধারণা বাংলাদেশই দিয়েছে। এমডিজি'র লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশের সাফল্যও সারা বিশ্বে প্রশংসিত এবং এর স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ ছয়টি আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেছে। বাংলাদেশের এই অনন্য অর্জনের জন্য জাতিসংঘ বাংলাদেশকে এমডিজি'র 'রোল মডেল' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

বাংলাদেশ সরকার ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এবং ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ সালের বাজেটে এসডিজি'কে বিশেষ গুরুত্বসহ স্থান দিয়েছে। ইতোমধ্যে সরকার বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য ১৫৮টি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পূর্ণাঙ্গ কর্মকৌশল প্রণয়ন করে তা অনুসরণের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়কে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব প্রদান করেছে।

চলো বন্ধুরা, এবার জেনে নিই টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ কী কী এবং এরমধ্যে শিশু ও নারী অভীষ্টের বিস্তারিত বিষয়গুলো:

১. দারিদ্র্য বিলোপ, ২. ক্ষুধামুক্তি, ৩. সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ, ৪. মানসম্মত শিক্ষা, ৫. নারী-পুরুষের সমতা, ৬. নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন, ৭. সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানি, ৮. যথোচিত কর্ম ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, ৯. শিল্প উদ্ভাবন ও অবকাঠামো, ১০. অসমতা হ্রাস, ১১. টেকসই নগর ও সমাজ, ১২. দায়িত্বশীল ভোগ ও উৎপাদন, ১৩. জলবায়ু কার্যক্রম, ১৪. জলজ জীবন, ১৫. স্থলজ জীবন, ১৬. শান্তি ও ন্যায়বিচার কার্যক্রম প্রতিষ্ঠান ও ১৭. লক্ষ্যপূরণে অংশীদারিত্ব।

এই ১৭টি এসডিজি বাস্তবায়নে বাংলাদেশের ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০) যে অভীষ্টসমূহ গৃহীত হয়েছে এরমধ্যে মানসম্মত শিক্ষা ও

* বাল্য বিবাহ, জোরপূর্বক বিবাহসহ সব ধরনের ক্ষতিকারক চর্চা পরিহার করা।
* সরকারি সেবা, অবকাঠামো ও সামাজিক নিরাপত্তা নীতিমালার মাধ্যমে অবৈতনিক ও গৃহস্থালি কাজের স্বীকৃতি ও মূল্যায়ন করা। পরিবার ও পারিবারিক দায়িত্ব বন্টনের বিষয়টি জাতীয় পর্যায়ে উপযুক্ত করে তুলে ধরা।
* রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও জনজীবনে নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পূর্ণ ও কার্যকরভাবে নারীর অংশগ্রহণ ও সমান অধিকার নিশ্চিত করা।
* আইসিপিডি'র প্রোগ্রাম অব অ্যাকশন এবং বেইজিং প্লাটফর্ম অব অ্যাকশানের সমঝোতা অনুযায়ী, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যের অধিকারে নারীদের সার্বজনীন প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা।
* নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করতে জাতীয় পর্যায়ে অর্থনৈতিক সম্পদ, সম্পত্তির ওপর অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ, আর্থিক সেবা, ঐতিহ্য ও প্রাকৃতিক সম্পদ বিষয়ে সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নেওয়া।

নারী-পুরুষের সমতার বিষয়টি তোমাদের জানাচ্ছি-

* ২০-২৪ বছর বয়সী নারী শিক্ষার্থী ও পুরুষ শিক্ষার্থীর হারে সমতা আনয়ন।
* সরকারি চাকরিতে ৯ম ও তদূর্ধ্ব গ্রেডে নারী কর্মকর্তার অন্তর্ভুক্তি ২৫ শতাংশে উন্নীতকরণ।
* প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ছাত্র ভর্তির হার ১০০% নিশ্চিতকরণ।
* প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ।
* শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী হার বর্তমানে ৮০ শতাংশ থেকে ১০০ শতাংশে উন্নীতকরণ।

কিশোরী তথা নারী-পুরুষের সমতা অর্জনে মন্ত্রণালয়ভিত্তিক টার্গেটসমূহ

* সর্বক্ষেত্রে নারীদের উপর সব ধরণের বৈষম্য দূর করা।
* ঘরের ভেতরে কিংবা বাইরে নারীদের ওপর সব ধরণের সহিংসতা পরিহার ও যৌন নিপীড়নসহ সব ধরনের নির্যাতন বন্ধ করা।
* নারীর ক্ষমতায়নে প্রযুক্তি-বিশেষ করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো।
* সর্বক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নে নীতিমালা ও আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ জোরদার করা।
* ২০৩০ সালের মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে ছেলে-মেয়েদের জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে যথার্থ, মানসম্মত ও ফলপ্রসূ শিক্ষা নিশ্চিত করা।
* ২০৩০ সালের মধ্যে ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে শৈশব বিকাশ, যত্ন ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করা। প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী করে গড়ে তোলা।
* ২০৩০ সালের মধ্যে নারী-পুরুষ সবার জন্য কারিগরি, বৃত্তিমূলক এবং উচ্চতর এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুযোগ তৈরি করা।

* ২০৩০ সালের মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য দূর করা। সব ধরনের শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে অসহায়, অক্ষম, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী এবং অরক্ষিত পরিস্থিতিতে থাকা শিশুদের সমান অধিকার নিশ্চিত করা ইত্যাদি।

কিশোরী উন্নয়ন অর্থাৎ নারীর ক্ষমতায়নে ও জেন্ডার সমতা নির্ধারণে ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৪টি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এগুলো হলো-নারীর সামর্থ উন্নীতকরণ, নারীর অর্থনৈতিক প্রাপ্তি বৃদ্ধিকরণ, নারীর মত প্রকাশ ও মত প্রকাশের মাধ্যম সম্প্রসারণ এবং নারীর উন্নয়নে একটি সক্রিয় পরিবেশ সৃষ্টিকরণ। এ লক্ষ্য পূরণে মন্ত্রণালয়গুলোতে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়ন করা হচ্ছে। সকল মন্ত্রণালয়ে নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ করা হয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রীদের শিক্ষা বৃত্তি ও উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প সারাদেশে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ক্লাবে সংগঠিত করে কিশোর-কিশোরীদের ক্ষমতায়নে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

সেলাই মেশিন বিতরণ, কম্পিউটার ও বিউটিফিকেশন প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা সুবিধা, আবাসন ও অন্যান্য সুবিধা, সামাজিক ক্ষমতায়নে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণসহ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা নারীদের ভাতা, মাতৃত্বকালীন ভাতাভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি, নারীর দরিদ্রতা হ্রাস, সামাজিক নিরাপত্তা এবং নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির জন্য বয়স্ক ভাতা, ক্ষুদ্র ঋণ, স্বকর্মসংস্থানমূলক সহায়তা প্রদানের জন্য এককালীন আর্থিক সাহায্য প্রদান এবং দুস্থ নারীদের আইনগত সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।

এর ফলে প্রশাসনে ব্যাপক হারে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। স্পিকার, মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, বিচারপতি, সিনিয়র সচিব, সচিব, ব্যাংকিং সেক্টরে উচ্চ পদ, রাষ্ট্রদূত, উপাচার্য, জেলা প্রশাসক, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী, পুলিশবাহিনী, মানবাধিকার কমিশন, তথ্য কমিশনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীরা কাজ করছেন। বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট-২০১৬ অনুযায়ী ১৪৪টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৭২তম। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান ৬ষ্ঠ।

জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এসডিজি

তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

বন্ধুরা শিরোনাম পড়েই যেনো ভয় পেয়ো না। কষ্ট করে পড়তে থাকো আস্তে আস্তে সব বুঝে যাবে। আর যেটি না বুঝ তার জন্য তো তোমাদের বাবা-মারা আছেনই।

শুরুতেই বলি জাতিসংঘ কী?

জাতিসংঘ হচ্ছে-বিশ্বের জাতিসমূহের একটি সংগঠন। যার লক্ষ্য এক কথায় বলতে গেলে সারাবিশ্বের মানুষের শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। জাতিসংঘ গঠিত হয় ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর। বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর এর সদস্য হয়। বর্তমানে এর সদস্য দেশ ১৯৩টি।

এবার বলি টেকসই উন্নয়ন কী-টেকসই উন্নয়ন হচ্ছে এমন একটা উন্নয়ন যা বর্তমান জনসংখ্যারই সব প্রয়োজন শুধু মেটাবে না এটা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রয়োজন মেটাতেও সমর্থ হবে। এজন্যই তোমরা এখন যারা ছোটো আগামী ১৫ বছরে তারা বড়ো হবে। তাই এখন থেকেই তোমাদের টেকসই উন্নয়ন সম্পর্কে ধারনা নিতে হবে।

এমডিজি থেকে এসডিজি

মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল বা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজির) মেয়াদ শেষ হয়েছে ২০১৫ সালে। আর ২০১৬ থেকে শুরু হয়েছে ১৫ বছর মেয়াদি 'সাসটেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল' বা এসডিজি। তবে এমডিজির আটটির বিপরীতে এসডিজিতে পূরণ করতে হবে ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা।

২০০০ সালে জাতিসংঘ মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল সহস্রাব্দের লক্ষ্যমাত্রা এসডিজি ঘোষণা করে, যা শেষ হয় ২০১৫ সালে। বাংলাদেশ জাতিসংঘের ভাষাতেই এসডিজির লক্ষ্য অর্জনে অনুসরণীয় সাফল্য দেখিয়েছে। এ কারণেই বাংলাদেশকে বলা হয় এসডিজির 'রোল মডেল'।

এমডিজির ব্যাপকতা এসডিজির চেয়ে অনেক বেশি। প্রতিটি রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এসডিজির সফল বাস্তবায়নের মধ্যে। এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে যে

ঘাটতিগুলো রয়েছে তা এসডিজির মাধ্যমে পূরণ হবে এবং মানুষের কল্যাণে আরো কিছু নতুন মাত্রা যোগ হবে।

এসডিজির সফলতার মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য দূরীকরণের ন্যায় ও সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতসমূহ মোকাবিলা করে একটি টেকসই ও নিরাপদ বিশ্ব আগামী ১৫ বছরের মধ্যে নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

তোমরা কী জানো এসডিজির এই মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। মোট ১৭টি অভীষ্টের মধ্যে ১১টি অভীষ্টের ধারণাই বাংলাদেশ দিয়েছে। তাই এসডিজির লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশের সাফল্য সারাবিশ্বে প্রশংসিত। বিগত বছরগুলোতে এমনকি সাম্প্রতিক বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার সময়েও বাংলাদেশের ৬ শতাংশের বেশি জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ৭.১১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এই হার ৭.০.৫%। দারিদ্র্যতার হার নব্বইয়ের দশকের শুরুর দিকের ৫৫.৭ শতাংশ থেকে ২৪ শতাংশে নেমে এসেছে। প্রাথমিক শিক্ষায় ছাত্র ভর্তির হার শতভাগে উন্নীত হয়েছে। শিশুমৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ১৪৬ থেকে ৪৬-এ নেমে এসেছে। মাতৃমৃত্যুর হারও উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে। এমডিজিতে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ ছয়টি আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেছে। এত বেশি সংখ্যক পুরস্কার আর কোনো দেশ অর্জন করতে পারেনি। এ কারণেই বাংলাদেশকে জাতিসংঘ এমডিজির রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

এমডিজির নির্ধারিত ১৫ বছরের মেয়াদ শেষ হয়েছে ২০১৫ সালে। এসডিজি হলো গত পনেরো বছরের চলমান এমডিজির আধুনিক সম্প্রসারিত রূপ। এতে টেকসই উন্নয়নকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ধনী গরীব সকল দেশকেই সমানভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

জাতিসংঘ সারাবিশ্বের উন্নয়ন টেকসই করতে যে ১৭টি লক্ষ্য এসডিজি নির্ধারন করেছে সেগুলো হলো-১. দারিদ্র্য বিমোচন, ২. ক্ষুধামুক্তি, ৩. সুস্বাস্থ্য, ৪. মানসম্মত শিক্ষা, ৫. জেন্ডার সমতা, ৬. বিশুদ্ধ পানি ও স্যানিটেশন, ৭. টেকসই জ্বালানি, ৮. সবার জন্য ভালো কর্মসংস্থান, ৯. উদ্ভাবন ও উন্নত অবকাঠামো, ১০. বৈষম্য হ্রাসকরণ, ১১. টেকসই শহর ও সম্প্রদায়, ১২. সম্পদের দায়িত্বশীল ব্যবহার, ১৩. জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধ, ১৪. সমুদ্রের সুরক্ষা, ১৫. ভূমির সুরক্ষা, ১৬. শান্তি ও ন্যায়বিচার, ১৭. লক্ষ্যপূরণে অংশীদারিত্ব। এই ১৭টি লক্ষ্য ২০৩০ সালের মধ্যে বাস্তবায়ন করার জন্য বিশ্বের প্রায় সব দেশ একমত হয়েছে জাতিসংঘের এক সাধারণ সভায়। আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

দারিদ্র্যদূরীকরণ

এসডিজির প্রথম স্বপ্ন হচ্ছে সব দেশ থেকে সব ধরনের দারিদ্র্যতা দূর করা।

তোমরা কী জানো বিশ্বে এখনও ৮৩ কোটি ৬০ লাখ মানুষ খুবই দরিদ্র। যাদের প্রতিদিনের আয় ১ ডলার ২৫ সেন্টেরও কম। যা বাংলাদেশের ১০০ টাকারও কম। এত কম আয় দিয়ে কখনো মানুষ ১ বেলা বা ২ বেলা, কখনো ভরা পেট খেয়ে বা কখনো আধ পেট খেয়ে বেঁচে থাকে। তবে ২০৩০ সালের মধ্যে পৃথিবীতে এ ধরনের মানুষ আর থাকবে না। কারণ তাদের চরম দারিদ্র্যতা থেকে বের করে আনতে টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে কিছু নির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে জাতিসংঘ। যেমন-পৃথিবীর সব দেশের চরম দারিদ্র্যতাকে একেবারে নির্মূল করা। সেটি নারী-পুরুষ-শিশু সব বয়সের দারিদ্র্যতাকেই বুঝানো হয়েছে। দরিদ্র এবং ঝুঁকিতে থাকা সব মানুষদের সামাজিকভাবে নিরাপত্তা দান করা। যারা খুব ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে তাদের টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য

খাদ্যের অভাবে থাকা সব বয়েসি মানুষের ক্ষুধা দূর করা। পাঁচ বছরের কম বয়েসি শিশু থেকে শুরু করে অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে, নারী এবং বয়স্ক ব্যক্তিদের পুষ্টির চাহিদা পূরণ করা।

কৃষকরা যাতে সঠিকভাবে কৃষি পণ্য উৎপাদন করতে পারে তাদের সব ধরনের সুযোগসুবিধা নিশ্চিত করা। বন্যা, খরার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগেও যাতে ফসল টিকে থাকে তা নিশ্চিত করা। বিশ্বে যাতে খাদ্যপণ্যের দাম স্থিতিশীল থাকে সবাই যাতে খুব সহজেই পেতে পরে সেজন্যেও টেকসই উন্নয়ন নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

করবে। তাদের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করার চেষ্টা করবে। এছাড়া কেউ কেউ ঋণ নিয়ে ব্যবসা করতে চাইলে তাদের ঋণ দিয়েও সাহায্য করা হবে।

ক্ষুধামুক্তি

টেকসই উন্নয়নের দ্বিতীয় স্বপ্ন হচ্ছে, খাদ্য নিরাপত্তা, টেকসই কৃষি উন্নয়ন নিশ্চিত করে ক্ষুধামুক্ত পৃথিবী গড়ে তোলা। তার মানে তোমরা বুঝতে পেরেছ। ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বে আর একটি শিশুও ক্ষুধার্ত থাকবে না। একটি মানুষও পুষ্টিহীনতার স্বীকার হবে না। একটি শিশু না খেয়ে স্কুলে যাবে না।

তোমরা কী জানো, বর্তমান বিশ্বের প্রতি ৯ জনে একজন অপুষ্টির শিকার। এটি হিসেবে অপুষ্টির শিকার মোট জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রায় ৭৯ কোটি ৫০ লাখ মানুষ। এর বেশিরভাগ সংখ্যা এশিয়া মহাদেশের। এটি শুনলে আরো অবাক হবে যে, সারাবিশ্বে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ে এমন প্রায় ৬ কোটি ৬০ লাখ শিশু ক্ষুধার্ত অবস্থায় স্কুলে যায়।

২০৩০ সালের মধ্যে ক্ষুধা দূর করে নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করে কৃষিতে টেকসই উন্নয়নের জন্য আগামী ১৫ বছরের জন্য ৮টি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে জাতিসংঘ। যেমন–মাত্র জন্ম নেওয়া শিশু থেকে শুরু করে নিরাপদ

বিশুদ্ধ পানি ও স্যানিটেশন

এসডিজির ১৭টি লক্ষ্যের মধ্যে পানি ও স্যানিটেশন হচ্ছে ৬ নম্বরে। এসডিজি-৬ এ সবার জন্য স্যানিটেশন ও সহজে বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থাপনার কথা বলা হয়েছে।

নিরাপদ পানীয় জল পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থায় সবার অন্তর্ভুক্তির সুযোগ বৃদ্ধি করা। পানি পরিশোধন দূষিত পানির ব্যবস্থাপনা, প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট পরিমাণ পানি, পানির যথাযথ ব্যবহার এবং পানির উৎসগুলোর সঠিক ব্যবস্থাপনার কথা বলা হয়েছে।

স্বাস্থ্য বিষয়ে টেকসই উন্নয়ন

মো. জামাল উদ্দিন

স্বাস্থ্যই সকল সুখের মুল। স্বাস্থ্য ভালো থাকলে মন ভালো থাকে। আর মন ভালো থাকলে যে-কোনো কাজে উন্নতি করা যায়। সরকারের উদ্দেশ্য গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা। কারণ সুস্থ জাতিই পারে- বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে।

সুস্থ জাতি গড়তে হলে সুস্থ মা দরকার। তাই সরকার মাতৃত্বকালীন যাবতীয় সেবা দ্বারাই শুরু করেছেন স্বাস্থ্যসেবা। মা ও শিশুর খাদ্য ও পুষ্টির বিষয়ে সহায়তা প্রদান। বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যা নিয়ে পরামর্শ প্রদান। জটিল স্বাস্থ্য সমস্যার ক্ষেত্রে উন্নততর চিকিৎসার জন্য উপজেলা ও জেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রেরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

সরকার ইতোমধ্যে স্বাস্থ্যখাতে বেশ কিছু অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। গ্রামের প্রতি ৬০০০ মানুষের জন্য একটি কমিউনিটি ক্লিনিক গড়ে তোলা হয়েছে। সারাদেশে ১৬ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করা হয়েছে। ফলে গ্রামের সুবিধাবঞ্চিত মানুষকে বিনামূল্যে চিকিৎসা করা হচ্ছে। কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে বিনামূল্যে ৩০ প্রকার ওষুধ সরবরাহ করা হচ্ছে।

টেকসই উন্নয়নে সরকার স্বাস্থ্যসেবায় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। সন্তান জন্মদানের সময় চিকিৎসার অভাবে অনেক মা মারা যায়। ২০৩০ সালের মধ্যে এই মাতৃমৃত্যুর হার লাখে ৭০ জনের নিচে নেমে আসবে। এতে নতুন শিশু আর মারা যাবে না। ফলে ৫ বছর বয়সী শিশুদের মৃত্যু ঠেকানো যাবে।

মহামারি আকারে যেসব রোগ ছড়িয়ে পড়ে তা থেকে মানুষ রক্ষা পাবে। যেমন- এইডস, যক্ষ্মা ও ম্যালেরিয়া রোগ। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রোগবালাই আক্রমণ করতে পারবে না। হেপাটাইটিস, পানিবাহিত ও অন্যান্য সংক্রামক রোগ মোকাবিলা করা সহজ হবে। এভাবে অসংক্রামক রোগে মৃত্যুহার নামিয়ে এনে সুস্বাস্থ্যের প্রসার ঘটানো হবে।

ধনী-গরিব সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা দিতে সরকার বদ্ধপরিকর। সকলের জন্য অপরিহার্য স্বাস্থ্যসেবা ও নিরাপদ, কার্যকরী, মানসম্মত এবং কম মূল্যে অপরিহার্য ওষুধ সরবরাহ। টিকাদানের সুবিধা প্রদান, ওষুধ ও টিকা তৈরির গবেষণায় সহায়তা করে চিকিৎসা ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা হবে।

প্রাথমিকভাবে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এসব রোগের প্রাদুর্ভাব। তাই বাংলাদেশে সাশ্রয়ী মূল্যে ওষুধ ও টিকা সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে। গণস্বাস্থ্য রক্ষায় মেধা সম্পত্তি বাণিজ্য চুক্তি অনুযায়ী পূর্ণ সুবিধা পাবে বাংলাদেশ। বিশেষ করে সকলের জন্য ওষুধের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা হবে। স্বাস্থ্যখাতে পর্যাপ্ত অর্থায়ন বাড়ানো হবে। এর ফলে এ খাতে সংশ্লিষ্টদের নিয়োগ প্রক্রিয়া, উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বেড়ে যাবে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য ঝুঁকির ক্ষেত্রে আগাম সতর্কবার্তা, ঝুঁকি হ্রাস ও ব্যবস্থাপনার বিষয়ে বাংলাদেশের সক্ষমতা বাড়বে।

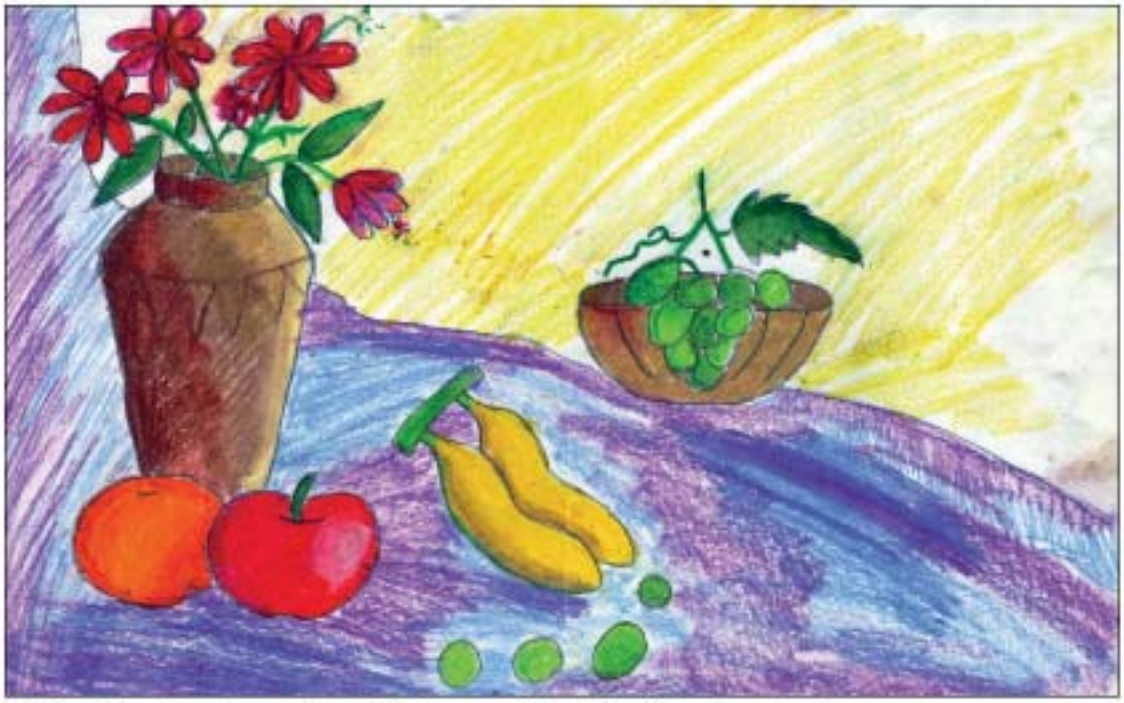

আমিনুল ইসলাম, পঞ্চম শ্রেণি, মতিঝিল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ঢাকা

আতিক লাবিব, চতুর্থ শ্রেণি, আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মুগদা শাখা

ফাইরুজ ওয়াসিমা ইসানা, পঞ্চম শ্রেণি, মাইলস্টোন প্রিপারেটরি কে.জি. স্কুল, উত্তরা, ঢাকা

জায়েদা ইবনাত লুবা, সপ্তম শ্রেণি, ড. খাস্তগীর স্কুল, চট্টগ্রাম

মুয়াজ আবদুল্লাহ, তৃতীয় শ্রেণি, বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল, ইস্কাটন, ঢাকা

অজাজী খান স্বাতী, ৬ষ্ঠ শ্রেণি, গোপালপুর করিমুন্নেছা উচ্চবিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ

স্বর্ণা রহমান, দশম শ্রেণি, ভিকারুন নিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

তাহসিমা তাবাসসুম ঈশিতা, পঞ্চম শ্রেণি, হাজিগঞ্জ বালিকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়